দিনেন্দ্র রচনাবলী

৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত

মূল্য—১৸৹

ভূমিকা

দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমার গান শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন তার নিজের গান শুনিনি। কখনো কখনো কোন কবিতায় তাকে সুর বসাতে অনুরোধ করেছি, কথাটাকে একেবারেই অসাধ্য ব'লে সে উড়িয়ে দিয়েছে। গান নিয়ে যারা তার সঙ্গে ব্যবহার করেছে, তারা জানে সুরের জ্ঞান তার ছিল অসামান্য। আমার বিশ্বাস গান সৃষ্টি করা এবং সেটা প্রচার করার সম্বন্ধে তার কুণ্ঠার কারণই ছিল তাই। পাছে তার যোগ্যতা তার আদর্শ পর্য্যন্ত না পৌঁছয়, বোধ করি এই ছিল তার আশঙ্কা। কবিতা সম্বন্ধেও সেই একই কথা; কাব্যরসে তার মতো দরদী অল্পই দেখা গেছে। তা ছাড়া কবিতা আবৃত্তি করবার নৈপুণ্যও ছিল তার স্বাভাবিক। বিশেষ উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদেরকে আবৃত্তি শিক্ষা দেবার প্রয়োজন ঘটলে, তাকেই অনুরোধ করতে হয়েছে। অথচ কবিতা সে যে নিজে লেখে, এ কথা প্রায় গোপন ছিল বললেই হয়। অনেকদিন পূর্ব্বে কয়েকটি ছোটো ছোটো কবিতা সে বই আকারে ছাপিয়েছিল। ছাপা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু পাঠকসমাজে সেটা প্রচার করবার জন্যে সে লেশমাত্র উদ্যোগ করেনি। আমার মনে হয় কোনো একজনের উদ্দেশে তার রচনা নিবেদন করাতেই পেয়েছে সে তৃপ্তি, পাঠকসাধারণের স্বীকৃতির দিকে সে লক্ষ্যই করেনি। চিরজীবন অন্যকেই সে প্রকাশ করেছে, নিজেকে করেনি। তার চেষ্টা না থাকলে আমার গানের অধিকাংশই বিলুপ্ত হোত। কেননা, নিজের রচনা সম্বন্ধে আমার বিস্মরণশক্তি অসাধারণ। আমার সুরগুলিকে রক্ষা করা এবং যোগ্য এমন কি অযোগ্য পাত্রকেও সমর্পণ করা তার যেন একাগ্র সাধনার বিষয় ছিল। তাতে তার কোনোদিন ক্লান্তি বা ধৈর্য্যচ্যুতি হোতে দেখিনি। আমার সৃষ্টিকে নিয়েই সে আপনার সৃষ্টির আনন্দকে সম্পূর্ণ করেছিল। আজ স্পষ্টই অনুভব করছি, তার স্বকীয় রচনাচর্চ্চার বাধাই ছিলেম আমি। কিন্তু তাতে তার আনন্দ যে ক্ষুণ্ণ হয়নি, সে কথা তার অক্লান্ত অধ্যবসায় থেকেই বোঝা যায়। আজ এতেই আমি সুখ বোধ করি যে, তার জীবনের একটি প্রধান পরিতুষ্টির উপকরণ আমিই তাকে জোগাতে পেরেছিলুম।

দিনেন্দ্রের যে পরিচয় আচ্ছন্ন ছিল, যে পরিচয় শেষপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিকাশ পাবার অবসর পায়নি, আমাদের কাছে সেইটিরই প্রতিষ্ঠা হোলো তার এই স্বল্পসঞ্চিত গানে ও কবিতায়। রচনা নিয়ে খ্যাতি-লাভের আকাঙ্ক্ষা তার কিছুমাত্র ছিল না, তার প্রমাণ হয়ে গেছে। তার নিজের ইচ্ছায় এতকাল এর অধিকাংশই সে প্রকাশ করেনি এবং বেঁচে থাকলে আজও করত না। সেইজন্যে এই বইটি সম্বন্ধে মনে কোনো সঙ্কোচ নেই যে, তা বলতে পারিনে। কিন্তু তার বন্ধু ছিল অনেক, তার ছাত্রেরও অভাব ছিল না, এদের সম্মুখে এবং আমাদের মতো স্নিগ্ধজনের কাছে এই লেখাগুলি নিয়ে তার একটি মানসমূর্ত্তির আবরণ উদ্ঘাটিত হোলো—এই আমাদের লাভ।

১লা ভাদ্র, ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশিকার নিবেদন

যাঁর লেখাগুলি প্রচার করবার চেষ্টা করেছি, তিনি আজ ইহলোক থেকে বহু দূরে। তিনি ছিলেন নীরব পূজারী। তাঁর এই পূজা সার্থক হয়েছে যেখানে, সেখানে এ জগতের ভালমন্দ স্পর্শ করে না। তাঁর এই অপ্রকাশিত রচনাবলী প্রকাশ করা উচিত কি অনুচিত হয়েছে, বুঝতে পারছিনে। তাঁর বন্ধু ও ছাত্রদের অনুরোধে এবং আমাদের তৃপ্তির জন্য এই অল্প ক'টি লেখা ছাপানো হ'ল। তিনি যে লোকেই থাকুন, আমাদের এই দুর্ব্বলতাটুকু ক্ষমা ক'রবেন, এই আমার বিশ্বাস।

এই লেখাগুলি বই আকারে প্রকাশ করা কখনই সম্ভব হ'ত না, যদি না পূজনীয়া ইন্দিরা দেবীর সাহায্য পেতুম। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রূফসকল সংশোধন ক'রেছেন। আজ আমি তাঁর কাছে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত এবং শ্রীমান অনাদিকুমার দস্তিদার এই বইখানি বের করবার জন্য আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং অনেক সাহায্য করেছেন। পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূমিকাটি লিখে দিয়ে এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়ে বইখানির শ্রীবৃদ্ধি সাধন ক'রেছেন। অপরের স্মৃতিলিপিগুলি বইটির শেষভাগে সন্নিবেশিত করা হয়েছে এই জন্য যে, নানা মনের আলোয় আলোচ্য ব্যক্তির মানস-রূপ রেখাঙ্কিত চিত্রের মতই ফুটে ওঠে।

আজ এঁদের সকলের কাছেই আমার ব্যথিত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। সুধীসমাজে যদি এই রচনার সমাদর হয়, তবে নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রব। ইতি

নিবেদিকা

কমলা দেবী

গান ও স্বরলিপি

বিষয়	পত্রাঙ্ক
১। বলা যদি নাহি হয় শেষ	১
২। ঘুচাও ঘুচাও তব ঘন আবরণ	৩
৩। তব উৎসব প্রাঙ্গণে আজি	৬
৪। যেওনা যেওনা ফিরে	৮
৫। তোমার সুতায় গেঁথে লব	১০
৬। আজি আঁধার সাগর	১২
৭। আজি এ নিশীথে জাগে একাকী	১৪
৮। তারে কেমনে ধরিব হায়	১৭
৯। বুঝেছি বুঝেছি তব বাণী	১৯
১০। কোথা হতে এলে	২১
১১। পলাশ-রাঙা বাসনাগুলি	২৩
১২। পথপাশে মোর রচিনু দেউল	২৬
১৩। যারে ভালবেসেছিলি	২৯
১৩ (ক)। যদি এ মনে সঙ্গোপনে	৩০ (ক)

কবিতা

বিষয়	পত্রাঙ্ক
১৪। নীরব বীণা	৩১
১৫। বন্ধন	৩২
১৬। হৃদয়-তীর্থ	৩৩
১৭। আত্ম-গৃহ	৩৫
১৮। দুর্ভাগ্য	৩৫
১৯। আত্মদান	৩৬
২০। জ্যোৎস্না রাত্রি	৩৬
২১। রূপান্তর	৩৮
২২। যাত্রা	৩৮
২৩। মিলন	৩৯
২৪। দুইটী হৃদয়	৩৯
২৫। শরতের গান	৪০
২৬। অবসর	৪০
২৭। প্রতীক্ষা	৪১
২৮। বর্ষশেষ	৪২
২৯। নব বর্ষ	৪৩
৩০। বর্ষার গান	৪৩
৩১। শরৎ সভা	৪৪
৩২। অন্তরের ধন	৪৫
৩৩। বাসনা	৪৬
৩৪। গান	৪৭
৩৫। কবে	৪৭
৩৬। গান	৪৮
৩৭। বেদনা	৪৮
৩৮। অপরিচিত	৪৯
৩৯। নিরাশের আশা	৪৯
৪০। সঙ্কোচ	৫০
৪১। পরিপূর্ণতার রূপ	৫০
৪২। আশা	৫১
৪৩। হৃদয়-স্বামী	৫১
৪৪। সন্ধান	৫২
৪৫। নেহদং যদিদমুপাসতে	৫২
৪৬। স্বপ্রকাশ	৫৩
৪৭। চিরপরিচিত	৫৩
৪৮। কে জাগে	৫৪
৪৯। সান্ত্বনা	৫৫
৫০। জ্যোৎস্না	৫৬
৫১। প্রেমের ভাষা	৫৬
৫২। দুটি তার	৫৭
৫৩। মানসী	৫৭
৫৪। সহজশোভন	৫৮
৫৫। প্রকৃতির রূপ	৫৯
৫৬। নিরঞ্জন	৫৯

সূচীপত্র

বিষয়		পত্রাঙ্ক
৫৭।	শেষ রক্ষা	৬০
৫৮।	ব্যর্থতার মান	৬১
৫৯।	সার্থক দান	৬১
৬০।	বিশ্বপ্রেম	৬২
৬১।	সুরের মিল	৬২
৬২।	অতিথি	৬৩
৬৩।	অন্তরের উৎসব	৬৩
৬৪।	ভক্ত	৬৪
৬৫।	বিশ্বদেবতা	৬৪
৬৬।	সম্মিলন	৬৫
৬৭।	দুয়ারে	৬৬
৬৮।	বঁধু	৬৬
৬৯।	নিবেদন	৬৭
৭০।	সুদূর	৬৭
৭১।	সকল ভোলার দেশ	৬৮
৭২।	মজার-কথা	৬৯
৭৩।	গুহাহিতম্	৬৯
৭৪।	বর্ষশেষ	৭০
৭৫।	বিরহী	৭০
৭৬।	দরিদ্রের ধন	৭১
৭৭।	বরষা আবাহন	৭১
৭৮।	করুণকঠোর	৭২
৭৯।	ব্যর্থতা	৭২
৮০।	অচেনা	৭৩
৮১।	শিল্পীর প্রতি	৭৪
৮২।	চাতক সম	৭৪
৮৩।	কলিকা কহে	৭৫
৮৪।	বাদল রাতের	৭৫
৮৫।	সোণার রথে	৭৬
৮৬।	দুটি কথা	৭৬
৮৭।	দেওয়ার খেলা	৭৬
৮৮।	দেখা সে কি নয়নের	৭৭
৮৯।	আবাহন	৭৭
৯০।	শিল্পী নন্দলাল বসুকে লিখিত পত্র	৭৮
৯১।	আদিপর্ব্ব ও অন্তপর্ব্ব	৭৯
৯২।	রমা স্মরণে	৭৯
	প্রবন্ধ	
৯৩।	রবীন্দ্র সঙ্গীত	৮০
৯৪।	সঙ্গীত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	৮৩
	আশীর্ব্বাণী ও শুভেচ্ছা	
৯৫।	ছাত্র ও বন্ধুবর্গের খাতায় স্বাক্ষরিত খণ্ডকবিতা	৮৬
	দিনেন্দ্র স্মরণে	
৯৬।	দিনেন্দ্রনাথ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৯
৯৭।	দিনেন্দ্রনাথ—শ্রীঅমিতা সেন	৯১
৯৮।	দিনেন্দ্র স্মৃতি—শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন	৯৭
৯৯।	দিনেন্দ্রনাথ—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত	১০৬
১০০।	দিনেন্দ্র স্মরণে—শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার	১১০
১০১।	শান্তি-নিকেতনে তিনপুরুষ—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী	১১২
১০২।	শ্রদ্ধাঞ্জলি—শ্রীবীণাপাণি সান্ন্যাল	১১৮
১০৩।	স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভবিষ্যৎ পত্রিকা হইতে	১২১
১০৪।	শ্রদ্ধাঞ্জলি—শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার	১২২
১০৫।	স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীঅসিতকুমার হালদার	১২৩
১০৬।	দিনেন্দ্র স্মরণে—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	১২৩
১০৭।	দিনেন্দ্র-স্মৃতি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১২৪

৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম—২রা পৌষ, ১২৮৯

মৃত্যু—৫ই শ্রাবণ, ১৩

দিনেন্দ্র রচনাবলী

বলা যদি নাহি হয় শেষ,
তাহে নাহি মোর দুখলেশ।
খেলেছি ধরার বুকে
এই স্মৃতি বহি সুখে,
ভাসাব তরণী, লখি' সেই অজানার দেশ।
সুর যদি নাহি পাই খুঁজি,
আমার বেদনা লহ বুঝি।
নয়ন ভরিয়া দেখি
ভাবি যে মধুর এ কী,
এ আনন্দ সাথে লব তোমার সুরের রেশ।

II {মা মা | গা -রা গা I ন্‌া সা | রগা -মগা -রগা I রা -া | -া -া -া I
ব লা য ০ দি না হি হ০ ০০ ০য় শে ০ ০ ০ ষ্

I (রা গা | মা পা -া I পধা -ধপা | মগা -রা গা I মা -া | -া -া -া)} I
তা হে না হি ০ মো র্ দু ০ খ লে ০ ০ ০ শ্

I {মা পা | না -া না I র্সা -া | র্সনা র্সা -া I র্সর্রা -র্সা | ণধা র্সণা -ধা I
খে লে ছি ০ ধ রা র্ বু০ কে ০ এ০ ই স্ম তি ০

I পা পণা | ধা পা (-ধা)} I -া I ণা ধা | ণা -া ধা I র্ধর্সা ণা | ধা পা -া I
ব হি স্থ খে ০ ০ ভা সা ব ০ ত র ঙ্গী ল খি ০

I পা -ধা | পা -মা গা I রা গা | মা -া -া II
সে ই অ ০ জা না র দে ০ শ্

[ধা -র্সা | র্সণা -ধা]
II {মা -পা | পা -া পা I পা ধা | পধা -ণা ণধা I পা -া | -া -া -া I
স্থ র্ য ০ দি না হি পা ই খুঁ জি ০ ০ ০ ০

I (পা ধা | ণা র্সা -া I র্সনা র্সা | নর্রা র্সা -া I ণা ণা | ধা ণা -া)} I
আ মা র বে ০ দ না ল হ ০ ল হ বু ঝি ০

I {না না | না -া না I র্সা র্সা | র্সনা র্সা -া I নর্রা র্সা | ণা -ধা পমা I
ন য় ন ০ ভ রি য়া দে০ খি ০ ভা বি যে ০ ম

I পা পর্রা | র্রর্সা র্রা -না} I না না | না -র্সা র্সা I র্সর্রা র্সা | ণধা পা -া I
ধু র এ কী ০ এ আ ন ০ ন্দ সা থে ল ব ০

I পা পধা | পা মা -গা I রা গা | মা -া -া IIII
তো মা র স্থ ০ প্নে স্ব প্নে ০ শ্

২

ঘুচাও ঘুচাও তব ঘন আবরণ
করে নব মধুমাস ফুলসাজ বিতরণ।
মেল গো নয়ন।
শীত-পরশনে কেন
হানিছ বেদনা হেন,
হের সচকিত কুসুমের লাজ-শিহরণ।
মধুপ বিচরে তাই আজি দ্বিধাভরে,
ফুলের গোপন ব্যথা প্রাণে গুঞ্জরে।
ফুটেছিল যে মাধবী
মধু সুরভি-গরবী,
হের আনত নয়নে তার ধারা নির্ঝরণ।

II না র্সা -া | নর্সা -ণা | -ধা -পা I পা ধা -ধর্জ্জা | র্রা -া | র্সা -া I
ঘু চা ০ ০ ০ ০ ও ঘু চা ও ত ০ ব ০

I পা পা -ধা | ধনা -া | না -া I নর্সা -া -া | -া -া | মা মা I
ঘ ন ০ আ ০ ব ০ র ০ ০ ০ ণ্ ক রে

I মা পা পা | পা -া | পা -া I পা -ণা ধা | পা -ধা | পা -া I
ন ব ম ধু ০ মা স্ ফু ০ ল সা ০ জ ০

I মা -গা গপা | মা -া | -জ্ঞা -রা I সা সা -রা | জ্ঞা -া | -রা -সা I
বি ০ ত র ০ ০ ণ্ মে ল ০ গো ০ ০ ০

I সা রা -রপা | মা -া | -জ্ঞা -রা I সা রা জ্ঞা | সরা -া | সা -া II
মে ল ০ গো ০ ০ ০ মে ল গো ন ০ য়ন্ ০

| -া -া II { র্সজ্জা জ্জা র্রা | জ্জা -া | জ্জা র্রা I জ্জা -া -র্রা | জ্জা -া | -া -া I
০ ০ শী ত প র ০ শ নে কে ০ ০ ন ০ ০ ০

I র্রা র্মা জ্জা | র্রা র্রা | র্সা -না I র্সা -জ্জা -র্রা | র্সা -া | (-া -জ্জা)} I র্সা র্সা I
হা নি ছ বে দ না ০ হে ০ ০ ন ০ ০ ০ হে র

I না র্রা র্সা | র্সা -া | ণা ধা I র্সণা -া -ধা | পা -া | -া -া I
স চ কি ত ০ কু সু মে ০ ০ র ০ ০ ০

I পা -ধা পা | মা -পা | পণা -ধা I পা -া -ণা | ণা -ধা | ণা -া I
লা ০ জ শি ০ হ ০ র ০ ণ্ হে ০ র ০

I ধা র্সা ণা | ণা -া | ণা ধা I পা -ণা -ধা | পা -া | -া -া I
স চ কি ত ০ কু সু মে ০ ০ র ০ ০ ০

I পা -ধা পা | মা -পা | পণা -ধা I পা -া -া | -া -া | -া -া I
লা ০ জ শি ০ হ ০ র ০ ০ ০ ০ ০ ণ্

I সা সা -রা | জ্জা -া | -রা -সা I সা রা -রপা | মা -া | -জ্জা -রা I
মে ল ০ গো ০ ০ ০ মে ল ০ গো ০ ০ ০

I সা রা জ্জা | সরা -া | সা -া II
মে লে গো ন ০ য়ন্ ০

| -া -া II {সা গা গা | গা গা | গা -া I গমা -া -া | মা -গা | গমা -া I
০ ০ ম ধু প বি চ রে ০ তা ০ ই আ ০ জি ০

I জ্জা জ্জা -া | জ্জা -রা | জ্জা -া I জ্জা পা পা | মা -া | জ্জা -রা I
দ্বি ধা ০ ভ ০ রে ০ ফু লে র গো ০ প ন্

I সা -জ্ঞা -রা | সা -া | -রা -ন্‌া I ন্‌া সা -রা | সা -মা | জ্ঞা -রা I
ব্য ০ ০ থা ০ ০ ০ প্রা ণে ০ গু ০ ঞ্জ ০

I সা -া -া | -া -া | -া -া} I রর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা | র্জ্ঞা -া | র্জ্ঞা র্রা I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ফু টে ছি ল ০ যে মা

I র্জ্ঞা -া -র্রা | র্জ্ঞা -া | -া -া I র্রা র্মা র্জ্ঞা | রর্জ্ঞা -া | র্রা র্সা I
ধ ০ ০ বী ০ ০ ০ ম ধু স্ব র ০ ভি গ

I সর্রা -া -না | র্সা -া | র্সা র্সা I না র্রা র্সা | ণা ণা | ণা -ধা I
র ০ ০ বী ০ হে র আ ন ত ন য় নে ০

I {পা -ণা -ধা | পা -া | -া -া I পা -ধা পা | মা -পা | পণা -ধা I
তা ০ ০ র ০ ০ ০ ধা ০ রা নি ০ ঝ ০

I (পা -া -ণা | ণা -ধা | ণা -া I ধা র্সা ণা | ণা ণা | ণা -ধা)} I
র ০ ণ্‌ হে ০ র ০ আ ন ত ন য় নে ০

I পা -া -া | -া -া | -া -া I সা সা -রা | জ্ঞা -া | -রা -সা I
র ০ ০ ০ ০ ০ ণ্‌ মে ল ০ গো ০ ০ ০

I সা রা -রপা | মা -া | -জ্ঞা -রা I সা রা জ্ঞা | সরা -া | সা -া IIII
মে ল ০ গো ০ ০ ০ মে ল গো ন ০ য়ন্‌ ০

৩

তব উৎসব প্রাঙ্গণে আজি
এস নামি' ওগো সুন্দর !
তব উত্তরী-পরশে পবন
কর আজি সুধামন্থর।

শালমঞ্জরী গোপনে
হের ব্যথিত বিরহ যাপনে,
কোকিল কূজন ক্রন্দন ধ্বনি
ছাইল বন বনান্তর।

গগনে ইন্দু বন্ধু-দরশ তিয়াষে
বিনিদ্র কত যামিনী কাটাল কি আশে ?
জোছনা সুরভি চন্দনরসে
বিহ্বল করে অন্তর।

চপল হাস্যচঞ্চল কর
প্রাঙ্গণ ওগো সুন্দর !
আমমঞ্জরী যেথা পড়ে ঝরি'
সুরভিত পথে সঞ্চর।

মৃদুল মলয় বীজনে
মধু গুঞ্জন সৃজনে
নন্দিত কর কুঞ্জবীথিকা,
ব্যাকুল উদার প্রান্তর।

II {ধা ণা পা | -মা মা মা I মা -পধা মপা | মা জ্ঞা জ্ঞা I মা মণা ধা | ণা ধা ণধা I
তবউ ৎসব প্রা০ ঙ্গ ণেআজি এসনা মিওহে

I পা -র্সা না | র্রর্সা -ণা -ধা} I ধা না না | -র্সা র্সা র্সা I ণা র্রজ্ঞা র্রা | র্সনা র্সা র্সা I
সু০ন্দ র০০ তবঅ ০ঞ্চল পরশে পবন

I ণা র্সা ণা | ধা পধা মা I পা -র্সা না | র্রর্সা -ণা -ধা II
করআ জিসুধা ম০ন্থ র০০

I মা ধা ধা। -া ধা ণা I পা পণা ধা। -া ধা না I না র্সা র্সা। না র্সা ধনা I
শা ল ম ০ ঞ্জ রী গো প নে ০ হে র ব্য থি ত বি র হ

I না র্সনা র্সা। -া -া -া I র্সা র্মা র্মা। র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্রা -র্মা র্মর্জ্ঞা। র্রা র্সা র্সা I
যা প নে ০ ০ ০ কো কি ল কূ জ ন ক্র ০ ন্দ ন ধ্ব নি

I না র্রা র্সা। ণা ধা পমা I পা -র্সা র্সনা। র্রর্সা -ণা -ধা II
ছা ই ল ব ন ব না ০ স্ত র ০ ০

II সা মা মা। মা -া মা I মা -া মা। মা মা পা I গা মপা মা। -া -া -া I
গ গ নে ই ০ ন্দু ব ০ ন্ধু দ র শ তি য়া যে ০ ০ ০

I মা মা -পা। পা মা মা I মা ধা ধা। ণা ধা ণা I পা ধণা ধা। -া -া -া I
বি নি ০ দ্র ক ত যা মি নী কা টা ল কি আ শে ০ ০ ০

I ণা র্রা র্সা। ণা ধা ণা I পা -মা ধা। পা মা পা I মজ্ঞা -া জ্ঞা। জ্ঞা মা পা I
জো ছ না স্থ র ভি চ ০ ন্দ ন র সে বি ০ হ্ব ল ক রে

I রা -মা জ্ঞরা। সা -া -া I মা ধা ধা। ধা -া না I না -র্সা না। র্সা ধা না I
অ ০ স্ত র ০ ০ চ প ল হা ০ স্য চ ০ ঞ্চ ল ক র

I না -র্সা সর্রা। র্সা ধা না I না -র্সা না। র্সা -া -া I ণা র্রা র্সা। -া ণা ধা I
প্রা ০ ঙ্গ ণ ও গো সু ০ ন্দ র ০ ০ আ ম ম ০ ঞ্জ রী

I ধা ণা পা। মা মা পা I মা জ্ঞা মা। পা মধা পা I জ্ঞা -মা রা। সা -া -া I
যে থা প ড়ে ঝ রি সু র ভি ত প থে স ০ ঞ্চ র ০ ০

I র্সা র্মা র্মা। র্মা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা। -া -া -া I র্মা র্পা র্মা। -র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা I
মৃ দু ল ম ল য় বী জ নে ০ ০ ০. ম ধু গু ০ ঞ্জ ন

I র্সা না র্সা। -া -া -া I ণা -র্রা র্সা। র্সা না র্সা I ণা -র্সা ণা। ধা ণা ধা I
স্ব জ নে ০ ০ ০ ন ০ ন্দি ত ক র কু ০ ঞ্জ বী থি কা

I পা ধা পা। মা গা মা I পা -র্সা না। র্রর্সা -ণা -ধা II II
ব্যা কু ল উ দা র প্রা ০ স্ত র ০ ০

৪

যেওনা যেওনা ফিরে
ভিড়াও তরণী তব মানস তীরে।
তুমি যে এসেছ বারে বার
হৃদয়ে পাইনি সাড়া তার,
চরণ-নূপুর শুধু বেজেছে স্বপন ঘিরে।
নিভৃত বকুল শয়নে
নিবিড় মিলন হবে নয়নে নয়নে।
আসিবে বিদায় রজনী,
এ মালা শুকাবে যখনি,
তখন বিরহ ব্যথা জানাব নয়ন নীরে॥

সা রা II জ্ঞা -া -া -া | -া -রা সা রা I রপা -পমা -া জ্ঞরা | সা -া -া -া I
যে ও . না ০ ০ ০ ০ ০ যে ও না ০ ০ ফি রে ০ ০ ০

I মা ধা ধা ধা | ধা ণধা পধা -ণধা I পা -া -া -া | মা গা মা পা I
ভি ড়া ও ত র ণী ত ০ ব ০ ০ ০ মা ন স তী

I মা -পা -জ্ঞা -া | -া -রা সা রা II
রে ০ ০ ০ ০ ০ যে ও

II পা পা পা ধা | না র্সা র্সর্রা না I র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I
তু মি যে এ সে ছ বা রে বা ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্

I {না র্সা র্রা র্রা | র্রা র্রর্সা র্রা র্রর্মা I র্মজ্ঞা -া -া -া | (র্রা র্সা ণধা পা I
হৃ দ য়ে পা ই নি সা ড়া তা ০ ০ র্ তু মি যে এ

I ধা না র্সর্রা না | র্সা -া -া -া)} I -া -া -া -া I
সে ছ বা রে বা ০ ০ র্ ০ ০ ০ ০

I র্রা র্সা র্সর্রা র্সা । ণা ধা র্সণা -ধা I পা -ধা -মা -া । পা র্সা ণা ধা I
চ র ণ নূ পু র শু ০ ধু ০ ০ ০ বে জে ছে স্ব

I পা ধা মপা -ধপা । মজ্ঞা -রা সা রা II
প ন ঘি ০০ রে ০ যে ও

II সা গা গা গা । গা গা গমা মগা I মা -া -া -া । -া -া -া -া I
নি ভৃ ত ব কু ল শ য় নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা পা মা জ্ঞা । জ্ঞা রা মজ্ঞা -রা I সা -রা -ন্‌া -া । ন্‌া সা ন্‌সা -রজ্ঞা I
নি বি ড় মি ল ন হ ০ বে ০ ০ ০ ন য় নে ০০

I সরা রা সা -া । -া -া -া -া I {পা ধা মা পা । ধা -না র্সর্রা না I
ন য় নে ০ ০ ০ ০ ০ আ সি বে বি দা য়্ র জ

I র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I র্সা র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা । র্রা র্জ্ঞা র্রমা র্জ্ঞর্রা I
নী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ এ মা লা শু কা বে য খ

I র্সা -া -া -া । -া -া -া -া} I র্সা র্সা -র্রা র্সা । ণা ধা র্সণা -ধা I
নি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ত খ ন্ বি র হ ব্য ০

I পা -ধা -মা -া । পা র্সা ণা ধা I পা ধা মপা -ধপা । মজ্ঞা -রা সা রা IIII
থা ০ ০ ০ জা না ব ন য় ন নী ০০ রে ০ যে ও

৫

তোমার সূতায় গেঁথে লব আজি ভাবনা কুসুম মোর
পরিবে কি তব গলে যদি হল নিশি ভোর ?
ধূলার বক্ষে ঝরিয়া বিলীন
যা' কিছু আছিল শুষ্ক মলিন,
বিচ্ছেদভরে যা'ছিল ছড়ায়ে এনেছি কুড়ায়ে
বাঁধিতে মিলন ডোর।
মালা পর গলে যদি হল চিরনিশি ভোর ॥
সংশয় ঘেরা আঁধারের মাঝে ফুটি
শিথিলবাঁধন কাঁদিয়া পড়িছে লুটি'।
আজি প্রভাতের আলোকের গানে
মিলন বাঁধনে বাঁধ এক তানে ;
বরণ মালা রচিনু সুমধুর, কর আজি দূর
জনমের দ্বিধা মোর,
মালা পর গলে যদি হল চিরনিশি ভোর ॥

II মা ণদা -া । দা দা -া I পা দা দপা । মা মা পা I গা মা গা । ঋা সা ঋা I
তো মা র্ স্থ তা য়্ গেঁ থে ল ব আ জি ভা ব না কু সু ম

॥
I গা -মা -া । -া -া -া I মা মা মা । গা গা গা I মা ণদা -া । না র্সা -া I
মো র্ ০ ০ ০ ০ প রি বে কি ত ব গ লে ০ য দি ০

I পা পণা ণদা । দা পা -মগা II
হ ল নি শি ভো র্

II {দা দা -া । না -া র্সা I র্সঋা ঋা র্সা । র্সনা র্সা -া I র্সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । ঋা র্সা র্সা I
ধূ লা র্ ব ০ ক্ষে ঝ০ রি য়া বি লী ন্ যা০ কি ছু আ ছি ল

I না -র্সা না । দা পা -া} I জ্ঞা -া জ্ঞা । জ্ঞা রা জ্ঞা I র্মা জ্ঞা ঋা । র্সা ঋা র্সা I
শু ষ্ ক ম লি ন্ বি ০ চ্ছে দ ভ রে যা ছি ল ছ ড়া য়ে

I ণা র্সা ণা | দা ণা দা I পা দা পা | মা গা মা I পা -া -া | -া -া -া I
এ নে ছি কু ড়া য়ে বাঁ ধি তে মি ল ন ডো র্ ০ ০ ০ ০

I পর্সা র্সা র্সা | র্সা র্সঋা র্সা I ণা র্সা ণা | দা পা দা I পা দা দর্সা | -ণা -দা -পা II
মা লা প র গ০ লে য দি হ্ ল চি র নি শি ভো০ ০ ০ র্

II {সা -ঋা ঋা | ঋা ঋা ঋা I সা ঋা ঋা | -া ঋা সা I ন্া সা -া | -া -া -া I
সং ০ শ য় ঘে রা আঁ ধা রে র্ মা ঝে ফু টি ০ ০ ০ ০

I সা ঋা গা | মা মা -া I মা মা মা | গা মা পা I মা পা -া | -া -া -া} I
শি থি ল বাঁ ধ ন্ কাঁ দি য়া প ড়ি ছে লু টি ০ ০ ০ ০

I {দা দা দা | না র্সা -া I ঋা ঋা র্সা | -া না র্সা I র্সা ঋা ঋা | ঋা র্সা র্সা I
আ জি প্র ভা তে র্ আ লো কে র্ গা নে মি ল ন বাঁ ধ নে

I না র্সা না | -দা দা পা} I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | র্রা জ্ঞা র্রা I র্মা জ্ঞা জ্ঞা | ঋা র্সা -া I
বাঁ ধ এ ক্ তা নে ব র ণ মা লা র চি হ্ন সু ম ধু র্

I না র্সা ঋা | র্সা ণা -দা I পা পণা দা | পা মগা মা I পা -া -া | -া -া -া I
ক র আ জি দূ র্ জ ন০ মে র দ্বি০ধা মো ০ ০ ০ ০ র্

I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সঋা ঋর্সা I ণা র্সা ণা | দা পা দা I পা দা দর্সা | -ণা -দা -পা IIII
মা লা প র গ০ লে য দি হ্ ল চি র নি শি ভো ০ ০ র্

৬

আজি আঁধার সাগর মগন আমার এ পরাণ,
দূর অতলের হারাবাণী-স্রোতে ডেকেছে বান্।
তারায় তারায় যে লিপিখানি
ধীরে ধীরে নভে মেলিলে আনি
তাহার মর্ম্ম নিল জানি
মোর গভীর এ সন্ধান।
তারার আলোকে গাঁথা ছন্দের হার
অলখ নৃত্যে মাতি' তোলে ঝঙ্কার।
ভাবনা ডুলায়ে মোর বেদনা ভুলায়ে
নৃত্যপরশ প্রাণে দিল যে বুলায়ে,
গভীর আনন্দে মলিন ধূলা এ
পুলক-কম্পমান।

সা সা II সা -পা পা -া | পা -হ্মা ধপা হ্মা I গা মা গা -া | গা -দা ধপা -হ্মা I
আ জি আঁ ০ ধা র্ সা ০ গ ০ র ম গ ন ০ আ ০ মা র্

I গা -মা -গা ঋা | সা -া -া -া I সা -ঋা ঋা ঋা | সা -া সা সন্া I
এ ০ ০ প রা ০ ০ ণ্ দূ র্ অ ত লে র্ হা রা০

I সা -ঋা ঋা -া | সা -ন্া সা -া I গা মা পা -না | দা -হ্মা গা ঋা II
বা ০ ণী ০ স্রো ০ তে ০ ডে কে ছে ০ বা ন্ আ জি

II {পা -া গা -া | পা -হ্মা দা -া I দা -র্সা র্সা র্সা | র্সা -না ঋর্সা -া I
তা ০ রা য়্ তা ০ রা য়্ যে ০ লি পি খা ০ নি০ ০

I -া -া র্সা র্সা | র্সা -ঋা ঋা -া I -া -া র্সা র্সা | র্সনা র্সা ঋা -র্সা I
০ ০ ধী রে ধী ০ রে ০ ০ ০ ন ভে মে০ লি লে ০

I না -দা ম্মা -া | -া -া -া -া I গা -পা গা -া | পা -ম্মা পা -া I
আ ০ নি ০ ০ ০ ০ ০ তা ০ হা র্ ম র্ ম ০

I -া -া ম্মা পা | দা -পা ম্মা -া I গা -া গা ম্মা | পা ম্মা গা -মা I
০ ০ নি ল জা ০ নি ০ মো র্ গ ভী র এ স ন্

I গা -া -া -া | -া -া ঋা সা II
ধা ০ ০ ০ ০ ন্ আ জি

দ্রুত লয়

II {সা সরা -গা গা | গা গা গা রা I সা -রা গা রা | সা -া -া -া I
তা রা০ র্ আ লো কে গাঁ থা ছ ন্ দে র হা ০ ০ র্

I পা পনা না ধা | -া ধা পা ম্মা I গা ম্মা পা -ম্মা | গা -া -া -া} I
অ ল০ খ ন্ ০ তো মা তি তো লে ঝ ঙ্ কা ০ ০ র্

I {পা পা গা গা | পা পা ধা -পা I ধর্সা র্সা র্সা র্সা | ঋর্সা -া র্সা -া I
ভা ব না ভু লা য়ে মো র্ বে০ দ না ভু লা০ ০ য়ে ০

I র্সা -া র্সা না | ধা ধা ধপা ধা I ধা না র্সা র্সনা | ধনা -ধা পা -া} I
নৃ ০ ত্য প র শ প্রা০ ণে দি ল যে বু লা০ ০ য়ে ০

I গা পা পা পম্মা | পা -ম্মা পা -া I ম্মা পা দা পা | ম্মা গা গা ম্মা I
গ ভী র আ০ ন ন্ দে ০ ধ রা র ধূ লা এ পু ল

I পা পা -ম্মা ম্মা | গা -া ঋা সা II II
ক ক ম্ প মা ন্ আ জি

৭

আজি এ নিশীথে জাগে একাকী
মম বিজন সাথী।
সব বাণী আজি লুপ্ত আঁধারে,
স্থির দীপশিখা মোর বেদনারে
জ্বালায়ে ধরেছি হৃদয় দুয়ারে,
রেখেছি আসন পাতি।
এস এস এস একাকী, মম বিজন সাথী।
রুদ্ধ অশ্রু গুমরি হৃদয়তলে
বিকশিয়া উঠে রজনীগন্ধার দলে।
সে সুরে মিলিয়া তব বাণী
গোপনে হবে যে কানাকানি,
নীলকান্ত এ পাত্রখানি
ভরিবে তিমির রাতি।
এস এস এস একাকী, মম বিজন সাথী।

II {সা -ণ্া সা | সা -ণ্া | দ্া -ণ্া I সা -মা -া | মা -া | -া -া I
আ ০ জি এ ০ নি ০ শী ০ ০ থে ০ ০ ০

I (মা -জ্ঞা -মা | মা -জ্ঞা | জ্ঞা -া I জ্ঞা -মা -দা | দা -ণা | ণা দা I
জা ০ ০ গে ০ এ ০ কা ০ ০ কী ০ ম ম

I মজ্ঞা মা মা | মা -জ্ঞা | সা -া)} I জ্ঞা মা -া | দা -া | দা -ণা I
বি০ জ ন সা ০ থী ০ স ব ০ বা ০ ণী ০

I ণা -র্সা -া | র্সা -া | -া -া I ণা -া দা | মা -দা | দা -ণা I
আ ০ ০ জি ০ ০ ০ লু প্ ত আঁ ০ ধা ০

I ণা -া -া | -া -া | -া -া I ণা র্সা ণা | ণা -া | দা -া I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ স্থি র দী প ০ শি ০

I মা -া -া | মা -া | -া -া I মা -জ্ঞা মা | জ্ঞা -া | সা -া I
খা ০ ০ মো ০ ০ র্ বে ০ দ না ০ রে ০

I ণ্‌া সা সা | ণ্‌া দ্‌া | দ্‌া -ণ্‌া I সা মা মা | মা মা | মা -জ্ঞা I
জ্বা লা য়ে ধ রে ছি ০ হৃ দ য় দু য়া রে ০

I জ্ঞা মা মা | মা -া | মা মা I মা -া -া | মা -া | -জ্ঞা -া I
রে খে ছি আ ০ স ন পা ০ ০ তি ০ ০ ০

I জ্ঞা -মা -দা | দা -া | -া -া I মা -দা -ণা | র্সা -া | -দা -ণা I
এ ০ ০ স ০ ০ ০ এ ০ ০ স ০ ০ ০

I র্সা -র্মা র্মা | র্জ্ঞা -া | র্সা -া I ণা -া -া | দা -া | মা -া I
এ ০ স এ ০ কা ০ কী ০ ০ ম ০ ম ০

I জ্ঞা মা মা | মা -জ্ঞা | জ্ঞা -সা II
বি জ ন সা ০ থী ০

II {সা -মা মা | মা -া | মা -া I মা মা মা | মা মা | মা -া I
রু ০ দ্ধ অ ০ শ্রু ০ গু ম রি হৃ দ য় ০

I মা -া -জ্ঞা | জ্ঞা -া | -া -া I জ্ঞা মা দা | দা -ণা | ণা দা I
ত ০ ০ লে ০ ০ ০ বি ক শি য়া ০ ও ঠে

I দা ণা দা | দা -মা | মা মা I মা -জ্ঞা -মা | জ্ঞা -া | -া -া} I
র জ নী গ ন্ ধা র দ ০ ০ লে ০ ০ ০

I জ্ঞা মা দা | দা ণা | ণা -র্সা I র্সা -া র্সা | র্সা -ণা | র্সা -া I
সে স্থ রে মি লি য়া ০ ত ০ ব বা ০ ণী ০

I ণা র্সা ণা | ণা -দা | মা দা I দা -ণা ণা | ণা -দা | দা -া I
গো প নে হ ০ বে যে কা ০ না কা ০ নি ০

I মা -জ্ঞা সা | সা ণ্া | দ্া ণ্া I সা -মা মা | মা -া | মা -া I
নী ০ ল কা ন্ ত এ পা ০ ত্র থা ০ নি ০

I সমা মা মা | মা মা | মা -া I মা -া -জ্ঞা | জ্ঞা -া | -া -া I
ভ০ রি বে তি মি র ০ রা ০ ০ তি ০ ০ ০

I জ্ঞা -মা -দা | দা -া | -া -া I মা -দা -ণা | র্সা -া | -দা -ণা I
এ ০ ০ স ০ ০ ০ এ ০ ০ স ০ ০ ০

I র্সা -র্মা র্মা | র্জ্ঞা -া | র্সা -া I ণা -া -া | দা -া | মা -া I
এ ০ স এ ০ কা ০ কী ০ ০ ম ০ ম ০

I জ্ঞা মা মা | মা -জ্ঞা | সা -া II II'
বি জ ন সা ০ থী ০

৮

তারে কেমনে ধরিব হায়,
সে যে কাছে এলে দূরে সরে যায়।
পরাণে ক্ষণে ক্ষণে পরশ বুলায়,
চকিতে মিলায়।
মোর আলোকে আঁধারে,
সে যে আসি বারে বারে
বিজলী-ঝলক সম রসস্রোতে ঢেউ উথলায়,
চকিতে মিলায়।
কি যে তার গোপন কথা,
নিভৃতে অজানা ক্ষণে শুনাইল তা।
তাহারি আকুল বাঁশী
কাঁদিছে হাওয়ায় ভাসি',
সে রাগিণী রহি' রহি' কাঁদে মোর নিভৃত কুলায়,
চকিতে মিলায়।

মা গা II {মা মণা ণদা দা | পা -া গমা -পদা | মপা -া -া -া | -া -া (সা সা I
তা রে কে ম০ নে ধ রি ০ ব০ ০০ হা০ ০ ০ ০ ০ য়্ সে যে

I সা ঋা গা মা | পা -দা দা -র্সা | দা ঋা র্সা ণা | দা -পা মা গা)} I -া -া I
কা ছে এ লে দূ ০ রে ০ দূ রে স রে যা য়্ "তা রে" ০ ০

I না না র্সা -া | র্সঋা -া র্সা -ঋা | ঋনা -া র্সা -া | -া -া -া -া I
প রা ণে ০ ক্ষ০ ০ ণে ০ ক্ষ ০ ণে ০ ০ ০ ০ ০

I পা দা ণা ণদা | পা -া -া -দা | মা পা দা দপা | মা -গা মা গা II
প র শ বু লা ০ ০ য়্ চ কি তে মি লা য়্ "তা রে"

-া -া II মা -দা দা দা । না -া র্সা -া । ঋর্সা -না র্সা -া । -া -া -া -া I
০ ০ মো র্ আ লো কে ০ আঁ ০ ধা ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I দা দা না র্সা । র্সা -জ্ঞা জ্ঞর্ঋা -র্সা । র্সনা -া র্সা -া । -দা -া -া -া I
সে যে আ সি বা ০ রে ০ বা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I দজ্ঞা র্রা জ্ঞা জ্ঞর্মা । জ্ঞা জ্ঞা ঋা -া । র্সা -া -া -া । ণা র্সা র্সঋা ঋর্সা I
বি ০ জ লী ঝ ল ক স ০ ম ০ ০ ০ র স স্রো ০ তে

I ণা -র্সা র্সণা দা । পা -া -া -দা । মা পা দা দপা । মা -গা মা গা II
ঢে উ উ থ লা ০ ০ য়্ চ কি তে মি লা য়্ "তা রে"

-া -া II {সা ঋা গা -মা । মা -া মা মা । মগা -পা পমা -পা । -গা -া -া -া I
০ ০ কি যে তা র্ গো ০ প ন ক ০ থা ০ ০ ০ ০ ০

I মা গা ঋা সা । ঋা ঋা গা -া । গা -মপা গা মা । গা ঋা সা -া} I
নি ভৃ তে অ জা না ক্ষ ০ ণে ০০ শু না ই ল তা ০

I দা দা না র্সা । ঋা র্সা ঋর্সা -না । র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I
তা হা রি আ কু ল বাঁ ০ ০ শী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I দা দা না র্সা । র্সা -জ্ঞা জ্ঞা -া । ঋা -া -া -জ্ঞঋা । -র্সা -া -া -া I
কাঁ দি ছে হাও য়া য়্ ভা ০ সি ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০

I র্সজ্ঞা জ্ঞা র্রা জ্ঞা । র্রা র্মা মজ্ঞা -ঋা । র্সা -া -া -া । ণা র্সা ঋা -র্সা I
সে ০ রা গি ণী র হি র ০ হি ০ ০ ০ বা জে মো র্

I ণা র্সা র্সণা দা । পা -া -া -দা । মা পা দা দপা । মা -গা মা গা IIII
নি ভৃ ত কু লা ০ ০ য়্ চ কি তে মি লা য়্ "তা রে"

৯

বুঝেছি বুঝেছি তব বাণী,
ধরার গোপন কথা এনেছ টানি'।
ছন্দে গেঁথেছ হার
মঞ্জরী-সম্ভার,
সুরভিত ভাষা তব ভুবন-ভুলানী।
এসেছি তোমার লীলাঘরে
মুকুলিত গীত মোর এনেছি থরে থরে।
এরি তালে ঝিরি ঝির্
শিরীষের মঞ্জীর
বাজায়ে দিয়েছ দোল হৃদয়-দুলানী।

বিলম্বিত লয়

II {র্সা না র্সা | -া -া -া I ণা ধা ণা | -া -া -া I
বু ঝে ছি ০ ০ ০ বু ঝে ছি ০ ০ ০

I ধা পা মা | -ধা পা -া ॥I (মা গা -া | রা পা মা I
ত ব বা ০ ণী ০ ধ রা র্ গো প ন

I গা রসা -া | সা গা মা I পা -ধা -ণা | র্সা -া -া)} I
ক থা০ ০ এ নে ছ টা ০ ০ নি ০ ০

I {মা -ধা ধা | ধা না না I র্সা -া -া | -া -া -া I
ছ ন্ দে গেঁ থে ছ হা ০ ০ ০ ০ র্

I র্সা -র্গা র্মা | র্পা র্মা -র্গা I র্র্সা -া -া | -া -া -া} I
ম ন্ জ রী স ম্ ভা র্ ০ ০ ০ ০ ০

I {না র্রা র্সা | ণা ধা পা I মা -া -া | গা -া -মা I
সু র ভি ত ভা ষা ত ০ ০ ব ০ ০

I পা পা ধা | ধপা -র্সা ণা I ধা -া -া | -া -া -া} II
ভু ব ন ভু ০ লা ণী ০ ০ ০ ০ ০

II {র্রা র্সা ণা | ধা -পা -মা I গা -া -া | সা রা গা I
এ সে ছি তো ০ ০ মা ০ র্ লী লা ঘ

I মা -া -া | -া -া -া I মা পা পা | পা মা গা I
রে ০ ০ ০ ০ ০ মু ঞ্জু লি ত গী ত

I মা -া -ণা | ধা -া -া I ধা ধা না | না র্সা -া I
মো ০ ০ র্ ০ ০ এ নে ছি থ রে ০

I না র্সা -া | -া -া -া} I মা ণা ধা | ধা ধা না I
থ রে ০ ০ ০ ০ এ রি তা লে ঝি রি

I র্সা -া -া | -া -া -া I র্সা র্গা র্মা | র্পা র্মা র্গা I
ঝির্ ০ ০ ০ ০ ০ শি রী যে র ম ন্

I র্রর্সা -া -া | -া -া -া I র্না র্রা র্সা | ণা ধা পা I
জীর্ ০ ০ ০ ০ ০ বা জা য়ে দি য়ে ছ

I মা -া -া | -গা -া -মা I পা পা ধা | পা -র্সা র্সণা I
দো ০ ০ ০ ০ ল্ হৃ দ য় ভু ০ লা

I ধা -া -া | -া -া -া II II
নী ০ ০ ০ ০ ০

১০

কোথা হ'তে এলে, কোথা যাবে তুমি কে জানে !
তবু জানি রবে চিরদিন নিভৃতের ধেয়ানে।
বনে অকারণ পুলক তোমার লাগে,
মনে অরূপের মোহন বিলাস জাগে,
এই আসা-যাওয়া গেঁথে লব আজি কি গানে।
অতিথি তোমারে পরাব সুরের মালা,
অনুরাগ-দীপে করিব ভবন আলা।
তব উদ্দাম নৃত্যছন্দে মাতি,
উৎসুক হিয়া কাটাবে দিবসরাতি,
বনবীথিকারে মুখরিত করি কি গানে।

II রা গা ধা | ধপা মা গা I রা মা মগা | রা সন্‌া সা I
কো থা হ তে এ লে কো থা যা বে তু মি

I রা গা মা | -া গা রা I রা পা পা | পক্ষা পক্ষা পা I
কে জা নে ০ ত বু জা নি র বে চি০ র

I পা -র্সা -নর্সা | -ধণা -পা -রা I রা গা মা | পা রা গা I
দি ০ ০০ ০০ ০ ন্ নি ভৃ তে র ধে য়া

I মা -পা -ধা | ধপা মা -গা II
নে ০ ০ ও গো ০

-া -া II পা পা পা | না নধা -না I র্সা র্রা র্রা | র্গর্রা র্সা -না I
ব নে অ কা র ণ্ পু ল ক তো মা র্

I না র্সা -া | -া -া -া I র্সা র্গা র্গর্রা | র্গা র্মা র্গা I
লা গে ০ ০ ০ ০ ম নে অ রূ পে র

I র্রা র্গা র্মা | র্গা র্রা র্সা I র্সা -া -না | ধা -া -না I
মো হ ন বি লা স জা ০ ০ গে ০ ০

I র্সা -র্গা র্গর্রা | র্সা না র্সা I ধা ণা ধা | পা রা গা I
এ ই আ সা যাও য়া গেঁ থে ল ব আ জি

I মা -ণা ণধা | পা -া -রা II
কি ০ গা নে ০ ০

-া -া II {মা পা পা | পা পা পা I পা ধা না | না র্সা র্সনা I
অ তি থি তো মা রে প রা ব স্ রে র

I ধনা -র্সা -র্সনা | ধপা -া -া I (পা ধর্সা র্সা | র্সা র্সা র্রর্সা I
মা ০ ০ ০ লা ০ ০ ০ অ নু রা গ দী পে

I র্সনা র্সা না | না ধা পা I পা -া -ধা | না -া -মা)} I
ক রি ব ভ ব ন আ ০ ০ লা ০ ০

I পা পা পা | -না নধা না I র্সা -া -র্রা | র্গর্রা -া র্সা I
ত ব উ ০ দ্দা ম নৃ ০ ত্য ছ ন্ দে

I না র্সা -া | -া -া -া I র্সা র্গা র্গর্রা | র্গা র্মা র্গা I
মা তি ০ ০ ০ ০ উ ৎ সু ক হি য়া

I র্রা র্গা র্মা | র্গা র্রা র্সা I র্সা -া -না | ধা -া -না I
কা টা বে দি ব স রা ০ ০ তি ০ ০

I র্সা র্সর্গা র্গর্রা | র্সা না র্সা I ধা ণা ধা | পা রা গা I
ব ন বী থি কা রে মু খ রি ত ক রি

I মা -ণা ণধা | পা -া -রা II II
কি ০ গা নে ০ ০

১১

পলাশ-রাঙা বাসনাগুলি
মনের বনে বিছায়ে,
আজিকে সব করম ভুলি
আসীন তারি নিছায়ে।
সুদূরে কে যে বাজায় বাঁশী,
অলস বেলা মন উদাসী,
ভাবনা মোর নয়নজলে
দিয়েছি সিঁচায়ে।

বঁধুর বনে কুসুম ফোটে
গন্ধ আসে তার,
বরণ তার মানস পটে
আঁকি যে বার বার।
এমনি করে কাটাই বেলা,
সুরের বানে ভাসাই ভেলা,
ভুলে যে গেছি বিভল সুখে
মন যে কি চাহে॥

II হ্মা পা পণা । ণদা -া । পা -া I হ্মা পা জ্ঞা । জ্ঞঋা -া । সা -া I
প লা শ০ রা ০ ঙা ০ বা স না গু ০ লি ০

I সা সজ্ঞা জ্ঞা । ঋা -া । সা -ন্া I সা -জ্ঞা জ্ঞরা । জ্ঞা -া । -া -া I
ম নে০ র ব ০ নে ০ বি ০ ছা য়ে ০ ০ ০

I মা পা পা । হ্মপা -া । জ্ঞা -মা I পা না না । র্সা -া । র্সা -া I
আ জি কে স০ ০ ব ০ ক র ম ভু ০ লি ০

I ণা র্সা ণা । ণদা -া । পা -া I হ্মা -দা দপা । হ্মপা -জ্ঞা । -মা -জ্ঞা II
আ সী ন তা ০ রি ০ নি ০ ছা য়ে০ ০ ০ ০

II র্সা -া -জ্ঞা | জ্ঞা -র্রা | জ্ঞা -া I র্সজ্ঞা -া -া | ঋা -র্সা | র্সা -া I
সু ০ ০ দূ ০ রে ০ কে ০ ০ যে ০ বা ০

I না -র্সা -ঋা | ঋা -র্সা | র্সা -ণা I দপা দা ণা | ণা -দা | দা -পা I
জা ০ য্ বাঁ ০ শী ০ অ ল স বে ০ লা ০

I পা -ণা ণা | ণা -দা | -া -ণদা I পা -া -া | -া -া | -া -া I
ম ন্ উ দা ০ ০ ০০ সী ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা পণা ধা | ণা -া | -া -া I ণর্সা র্সণা ণা | দা -া | পা -া I
ভা ব০ না মো ০ ০ র্ ন য় ন জ ০ লে ০

I পহ্মা পা দা | দা -া | পা -া I পহ্মা -পা -জ্ঞা | -মা -া | -জ্ঞা -া II
দি য়ে ছি সিঁ ০ চা ০ য়ে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II সা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা -রা | জ্ঞা -া I জ্ঞমা জ্ঞা জ্ঞা | ঋা -া | সা -া I
বঁ ধূ র ব ০ নে ০ কু সু ম ফো ০ টে ০

I সা -ঋা ঋা | ঋা -া | সা -ন্া I সা -া -া | -া -া | -া -া I
গ ন্ ধ আ ০ সে ০ তা ০ ০ ০ ০ ০ র্

I সা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা -া | জ্ঞা -মা I মা পা পা | পা -া | পা -া I
ব র ণ তা ০ র ০ মা ন স প ০ টে ০

I হ্মা পা জ্ঞা | জ্ঞা -মা | জ্ঞমা -পহ্মা I পা -া -া | -া -া | -া -া I
আঁ কি যে বা ০ র০ ০০ বা ০ ০ ০ ০ ০ র্

I হ্মা -পা জ্ঞা । জ্ঞা -া । জ্ঞা -মা I পা না -া । র্সা -া । র্সা -া I
এ ম্ নি ক ০ রে ০ কা টা ই বে ০ লা ০

I না র্সা র্জ্ঞা । র্ঋা -া । র্সা -া I র্সনা -া -া । র্সা -া । -া -র্ঋা I
সু রে র বা ০ নে ০ ভা ০ ০ সা ০ ০ ই

I ণা -র্সা -ণা । ণা -া । -া -র্সা I ণর্সা র্সা ণদা । দা -া । পা -ণা I
ভে ০ ০ লা ০ ০ ০ ভু০ লে যে০ গে ০ ছি ০

I দণা ণা ণদা । দা -া । পা -া I হ্মা -পা দা । দা -া । পা -া I
বি ভ ল০ সু ০ খে ০ ম ন্ যে কি ০ চা ০

I পহ্মা -পা -জ্ঞা । -মা -া । -জ্ঞা -া II II
হে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১

পথপাশে মোর রচিনু দেউল্
পথিক নিতুই আসে যায়।
কেহ আনন্দে হাসিয়া আকুল
কেহ মূর্চ্ছিত বেদনায়।

সে চলার পথে হৃদয় আমার
ধায় অকারণে, ফেরে বার বার,
দেবতা আমার চলে তারি সাথে
ভোলেনা পূজার খেলনায়।

দিনের আলোকে, নিশীথে আঁধারে,
বনে প্রান্তরে, কুটীরের দ্বারে,
চরণের ধ্বনি বাজে তালে তালে
বাজিছে আমার চেতনায়।

চলাতেই জাগে জনম মরণ
কালের বাঁধন ঘুচে যায়,
আদি ও অন্ত লভিল মিলন
যাত্রীদলের পায়-পায়॥

[পমা গমা]
II মগা মা মণা। ণদা পা -দা। মা পা দা। মপা পগা -া I
প০ থ পা০ শে মো র্ র চি নু দে০ উল্ ০

I গপা পগা -া। ঋা র্সা -ন্া। সা রমা মা। -া -া -া I
প০ থি ক্ নি তু ই আ সে০ যা ০ ০ য়্

I মা মা মা। পা -গা গা। মা দা দা। না র্সা -া I
কে হ আ ন ন্ দে হা সি য়া আ কু ল্

I সমা মা মা। -া মা মা। মগা মা মদা। -া -া -া II
কে০ হ মূ র্ ছি ত বে০ দ না০ ০ ০ য়

II দা দা দা | -া না র্সা | র্ঋা র্ঋা -র্সা | না র্সা -া I
সে চ লা র্ প থে হৃ দ য়্ আ মা র্

I র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্ঋা র্সা র্সা | ণা র্সা র্সণা | -দা পা -া I
ধা য়্ অ কা র ণে ফে রে বা র্ বা র্

I পা দা র্সা | র্ঋা র্সা -া | ণা র্সা ণা | দা পা পা I
দে ব তা আ মা র্ চ লে তা রি সা থে

I সা ঋা মা | মা মা -া | মগা মা মদা | -া -া -া II
ভো লে না পূ জা র্ খে০ ল না০ ০ ০ য়্

II সা ঋা -া | ঋা সা সা | ন্া সা ঋা | ঋা সা সা I
দি নে র্ আ লো কে নি শী থ আঁ ধা রে

I সা ঋমা মা | -া মা মা | গা মা গা | -ঋা ঋা সা I
ব নে০ প্রা ন্ ত রে কু টী রে র্ দ্বা রে

I ন্া সা গা | ঋা ঋা সা | ণ্া সা সঋা | ণ্সা দ্া ণ্া I
চ র ণে র ধ্ব নি বা জে তা০ লে০ তা লে

I ণ্া সা ঋা | গা গা -পা | গা ঋা সা | -া -া -া I
বা জি ছে আ মা র্ চে ত না ০ ০ য়্

I মা ণদা দা । -া ণা র্সা । ঋা ঋা র্সা । না র্সা -া I
চ লা০ তে ই জা গে জ ন ম ম র ণ্

I দা দা -া । ণা র্সা -র্জ্ঞা । র্জ্ঞা ঋা র্সা । -া -া -া I
কা লে র্ বাঁ ধ ন্ টু টে যা ০ ০ য়্

I র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা -র্রা র্জ্ঞা । র্জ্ঞর্রা র্মা র্জ্ঞা । ঋা র্সা -া I
আ০ দি ও অ ন্ ত ল০ ভি ল মি ল ন্

I ণা -পণা ণা । ণদা পা -া । গা -মা মদা । -া -া -া II II
যা ০০ ত্রী দ লে র্ পা য়্ পা০ ০ ০ য়্

১৩

যারে ভালবেসেছিলি
সে কি শুধু আছে মনে
আপনারি জালবোনা স্বপনের
কোণে কোণে।
প্রভাত বীণায় আজি
তারি স্মৃতি উঠে বাজি'
ব্যথাভরা ম্লান হাসি
বিকশিত ফুলবনে।
দখিন পবন তারি পরশ বুলায়
পাতায় পাতায় সে যে আঁচল দুলায়।
নীলাকাশে মনে লাগে
করুণ নয়ন জাগে
বিরহ কাঁদন তারি
শুনি কাকলী-কূজনে।

[দা]
দা ণ্ া II সা জ্ঞা ঋা | সা সণ্া -সঋা | সা -া -া | -া সা সা I
যা রে ভা ল বে সে ছি ০০ লি ০ ০ ০ সে কি

I সা সদা দা | পা মা -ঞ্চা | মা -া -া | -া -া -া I
শু ধু০ আ ছে ম ০ নে ০ ০ ০ ০ ০

I মা ঞ্চা মা | জ্ঞা রা -জ্ঞা | জ্ঞরা মা জ্ঞা | ঋা সা -ণ্া I
আ প না রি জা ল্ বো না স্ব প নে র্

I সা -া -ঋা | মজ্ঞা ঋা -া | সা -া -া | -া দা ণ্া II
কো ০ ০ ণে কো ০ ণে ০ ০ ০ "যা রে"

-া -া II {দা দা দা | ণা র্সা -র্ঋা | র্ঋণা -র্জ্ঞর্ঋা -া | র্সা -া -া I
০ ০ প্র ভা ত বী ণা য় আ ০০ ০ জি ০ ০

I ণা র্সা র্ঋা | র্সা ণা ণা | পণা -দণদা -া | পা -া (-দা)} -া I
তা রি স্ম তি উ ঠে বা০ ০০০ ০ জি ০ ০ ০

I পা দা পা | মা জ্ঞা রা | জ্ঞা -া -রা | জ্ঞা -া -রা I

ব্য থা ভ রা ম্লা ন হা ০ ০ সি ০ ০

I মা পা দা | ণা দা পা | মা জ্ঞা -া | ঋা সা -া II

বি ক শি ত ফু ল ব নে ০ "যা রে" ০

-া -া II সা মা মা | মা মা মা | মা -া -া | মা -া -া I

০ ০ দ খি ন প ব ন তা ০ ০ রি ০ ০

I মা পা দা | মপা মা -া | -া -া -া | -া -া -া I

প র শ বু লা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়

I মা মা -পা | দা ণা -র্সা | পণা -পদা -পা | মজ্ঞা -া -ঋা I

পা তা য় পা তা য় সে ০ ০ যে ০ ০

I সা ঋা জ্ঞা | ঋা সা -া | -া -া -া | -া -া -া I

আঁ চ ল দু লা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়

I {দা দা ণা | র্সা র্সর্ঋা র্সা | ণা র্সা -া | -া -া -া I

নী লা কা শে ম০ নে লা গে ০ ০ ০ ০

I ণা র্সা ণা | দা পা দা | দমা -া -পদা | দপা -া -া} I

ক রু ণ ন য় ন জা ০ ০০ গে ০ ০

I পা দা পা | মা জ্ঞা রা | জ্ঞা -া -রা | জ্ঞা -া -া I

বি র হ কাঁ দ ন তা ০ ০ রি ০ ০

I মা পা দা | ণা দা পা | মা জ্ঞা -া | ঋা সা -া II II

শু নি কা ক লী কূ জ নে ০ "যা রে" ০

বীণ

নীরব বীণা

মোর নীরব বীণা কতকালের
কত না অনাদরে,
ও সে তোমার সভা-গৃহের কোণে
রয়েছে একা পড়ে !

কেন যে আছে জানেনা তাও,
এবার তারে বুঝায়ে দাও ;
কি সুরে হাসে, কিসে কাঁদাও,
নিজ ইচ্ছা ভরে !

ও সে তোমার সভা-গৃহের কোণে
রয়েছে একা পড়ে !
তুমি আপন কোলে লহ তুলে
এযে তোমার বীণা,
দেখ তোমার সুরে মিলিয়ে সুর
এবার বাজে কিনা !

আপনি যবে বাজাতে যাই,
বেসুর বেজে ওঠে সদাই
রেখেছি আশা লইবে তায়
তুলিয়া নিজ করে,
ও সে তোমার সভা-গৃহের কোণে
রয়েছে একা পড়ে।

বন্ধন

সেদিন যে তুমি গিয়েছিলে খুলে চুলটি,
দুলায়ে করেতে মোহন কমল ফুলটি,
একটি ক্ষুদ্র পাপ্‌ড়ি তাহার,
খসে' পড়েছিল বক্ষে আমার,
বেগে বহেছিল পরশে যাহার
আমার হৃদয়-ধমনী,
হে মোর চিত্ত-হরণি !

কি জানি কাণেতে বেজেছিল কোন কথা কি !
শুনিতে তাহাই আজি এ মরম ব্যথা কি !
সব কাজে আজি এ মোর পরাণ
ব্যাকুল শুনিতে তব প্রেমগান ;
কর আজি মোরে, কর আহ্বান
বাহি' এস তব তরণী !
হে মোর চিত্ত-হরণি !

একবার শুধু মিলাও আঁখিতে আঁখিটি,
কর মোরে তব স্বর্ণ খাঁচার পাখিটি !
বদ্ধ করিও শৃঙ্খলে তব,
তোমার বন্দী চিরদিন রব ;
অনিমেষে তব মুখ অভিনব
হেরিব দিবসরজনী !
হে মোর চিত্ত-হরণি !

এমনি রহিব চিরদিন মোরা দু'জনায়,
তুমি গো মুক্ত, আমি বাঁধা তব পিঁজরায় !
অক্ষয় থাক্ এ মোর বাঁধন,
অনন্ত হোক্ এ প্রেমসাধন !
আশাভরা মোর আকুল কাঁদন
চেয়ে আছে তব শরণি !
হে মোর চিত্ত-হরণি !

হৃদয়-তীর্থ

সখি, প্রতিদিন তুমি মেলেছ নয়ন
উষার উদয় পানে গো ;—
কতনা প্রভাতে আকুল শ্রবণ
কত বিহঙ্গ গানে গো !

হিমভারাতুর কুসুমের হিয়া
কতনা অশ্রু ফেলেছে মুছিয়া
কত পরশন-স্মৃতি-বিজড়িত
পবন সুরভি আনে গো !
তারি মাঝে তুমি মেলেছ পরাণ
রজনীর অবসানে গো !

সখি, আমারও চিত্ত-উদয়-শিখরে
হের উষা নামে সুধীরে,
রাতুল চরণ শিশির-শীকরে
ওঠে ফুটে ঘন তিমিরে !

হেথাও অমল ফোটে শতদল
ঝরে ঝরঝর বরিষার জল,
কুঞ্জবিতানে ফোটে কদম্ব
নাচায়ে চিত্ত-শিখীরে !
সেথা এস নেমে ঘন তরুছায়ে
হৃদয়ের তটে সুধীরে !

সখি, অস্ত-পারের রাঙিমা হেথায়
জ্বলে দিবসের দহনে,
আকাশে যে তারা মিটি মিটি চায়
ফোটে তা হৃদয়-গহনে !

পূরণিমা রাতে যেই সুধাকর
রহে জাগি চির বিরহ-কাতর,
বেদনার রসে করে বিহ্বল
নিঝুম নিশীথ স্বপনে !
একা সেই জাগে আমার নীরব
আঁধার চিত্ত-গগনে !

সখি, বিশ্বহৃদয় নির্ঝরধারা
এইখানে নেমে এসেছে,
তটবন হতে কত পথহারা
ফুলফল স্রোতে ভেসেছে!
মহাসাগরের রূপের লহর
আছাড়ে হেথায় দিবস প্রহর,
কত বিচিত্র মরমের কথা
একসুরে হেথা মিশেছে!
কত হাসি, কত অশ্রুসলিল
এইখানে নেমে এসেছে!

সখি, হৃদয়ের নীরে নেমে এস ধীরে
স্নান কর তব সমাপন,
হেথা সুনিভৃত গহন তিমিরে
ফেলিও চরণ সুগোপন!
তব বিরহের গীত, যত ব্যথা,
আমার মরমে লভি' নীরবতা,
অকথিত ভাষে কতনা কাহিনী
হ'বে তোমা সাথে আলাপন!
যত কথা তব আছে,—যত গান,
হেথা এসে কর সমাপন!

আত্ম-গৃহ

হে ভারত ! তোমার এ শ্যাম-স্নিগ্ধ ছায়া-কুঞ্জ 'পরে,
কুসুমে পল্লবে ধান্যে বিকশিত উদার প্রান্তরে,
যে মহান্ গ্রন্থখানি সম্মুখেতে রাখিয়াছ খুলি',
তার ভাষা দাও শিখাইয়া ! অতীতের স্মৃতিগুলি,
স্তব্ধ যাহা বহুদিন, স্পন্দিত জাগ্রত করি তারে
ধ্বনিত করিয়া তোলো ! এ মহান্ জলধির পারে,
দূরদূরান্তরে তার পাঠাইয়া দাও সমাচার !
অবসাদ-ক্লান্ত প্রাণে নব প্রেম করহ সঞ্চার,
নব আশা ! উৎস যথা রুদ্ধ-বারি ধরা হতে টানি'
উচ্ছ্বসিত করে তারে, তেমনি তোমার মহাবাণী
প্রেমের মঙ্গল-ধারা বক্ষ হতে হরি' লয়ে আজ
উৎসারিত করি দিবে দিকে দিকে ধরণীর মাঝ !
তুমিতো রাখনি দূরে কাহারেও, আপন যে নয়
তারেও ডাকিয়া ঘরে চিরদিন দিয়েছ আশ্রয় !
তবে কেন হে জননি, যা'রা তব আপন সন্তান,
ছাড়িয়া তোমার ক্রোড় পরদ্বারে পায় অপমান ?
পর হ'তে পারে, তবু আপনারে পারেনা বুঝিতে,
ঘরে শত্রু আছে বসে', যায় মূঢ় পরেরে যুঝিতে !

দুর্ভাগ্য

তোমার এ পুণ্যস্বচ্ছ জাহ্নবীর তীরে
হে বঙ্গজননি ! তব কুটীরে কুটীরে,
যে পুরাণো শান্ত শক্তি ছিল সঙ্গোপনে,
আজি কোন বায়ু-বেগে, কোন শুভক্ষণে
এ ধূমান্ধ নগরীর বাতায়ন পথে
প্রবেশিল তারি কণা আজি কোনমতে।
সন্তানের মৃত দেহে করেছ সঞ্চার
ঈষৎ চেতনা, তাই আশা বাঁচিবার।
নাহি তবু বল মনে, নাহি বীর্য্য দেহে,
তাই আজি নাহি আশা এ দরিদ্র গেহে।
হিংসার প্রলয়-বাণ চাহে ত্যজিবারে
পরেরে নাশিতে ; তবু দুর্ভাগা না পারে
মঙ্গল শান্তির তরে দিতে বলিদান
আপনার স্বার্থপুষ্ট, দীনহীন প্রাণ।

আত্মদান

মধ্যাহ্নে ঘিরিয়া ছিল খর রবি-দাহ,
আঁধারিয়া ক্ষণ পরে এল বারিবাহ।
সরস অমৃতধারা বক্ষ মাঝে চাপি',
রসের আবেশখানি রেখেছিল ঝাঁপি';
আচম্বিতে কোথা হ'তে অহঙ্কারে ফুলি'
এল বায়ু বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ অসি তুলি'।
অমনি উদার বক্ষ মেলি' দিয়া তা'র
বরষিল তপ্ত বুকে অমৃতের ধার।
তেমনি যখন রসে ভরে যায় প্রাণ,
জানিনা কেমনে তারে করা যায় দান!
হেনকালে আসে যদি আবেগ-ঝটিকা,
হানে প্রাণে বেদনার বিদ্যুতের শিখা,
অমনি সে বিগলিত প্রেমরসধারা
অবিরাম বহে, মোরে করে আত্মহারা।

জ্যোৎস্নারাত্রি

সহসা কেন ঘুমের পরশন
চক্ষে মোর লাগে?
সারাদিনের অশ্রুবরষণ
চিত্তে নাহি জাগে!
স্বপ্নেদেখা অস্ফুট স্মৃতি প্রায়
অতীত ব্যথা কোথায় মিলে যায়!
আকাশ জুড়ি' পরাণ ভরি' আজ
উদয় নবরাগে!
সারাদিনের অশ্রুবরষণ
চিত্তে নাহি জাগে!

মগন দিক জোছনা সুমধুর,
তরল সুধাধারে
পরাণ ছাপি' হয়েছে ভরপুর—
রাখিতে নাহি পারে!
চাঁদের পাশে মেঘেরা চলে ছুটি',
সোহাগে করে আলোকে লুটোপুটি;
ধ্বনিয়া ফিরে সব নীরব গীত
আমার গৃহদ্বারে!
পরাণ ছাপি' হয়েছে ভরপুর—
রাখিতে নাহি পারে!

জগৎমাঝে একাকী কেগো বসি',
এ কোন্ রাজবালা!
মাথার 'পরে জাগে শুক্লশশী,
হেরিছে মেঘ-মালা!
কোমল হাতে বীণার তারগুলি
যত্নে বেঁধে বক্ষে নেছে তুলি',
গুমরি তাই গাহিছে মৃদু তানে
রুদ্ধ কত জ্বালা!
মাথার 'পরে জাগে শুক্লশশী,
হেরিছে মেঘমালা!

আমার সাথে যেন গো পরিচয়
হয়েছে কতদিন!
আজিকে হেরি সে বাহুকিশলয়
বক্ষ 'পরে লীন!
বসন্তের মৃদুল বায়ুভরে
চমকি' তার অঙ্গ থরথরে;
পুলকে মোর কাঁপিয়া উঠে হিয়া
বাজিয়া উঠে বীণ!
আজিকে হেরি সে বাহুকিশলয়
বক্ষ 'পরে লীন।

সহসা যবে ভাঙ্গিবে ঘুমঘোর
পাবনা তার দেখা,
রাঙিয়া রবে কেবলি বুকে মোর
কর-পরশ-রেখা।
নয়ন' পরে রবে বিরহ লোর,
স্বপন যাবে, রহিবে শুধু ঘোর;
সঙ্গীহারা রহিবে হেথা পড়ি'
ছিন্ন বীণা একা!
রাঙিয়া রবে কেবলি বুকে মোর
কর-পরশ-রেখা!

রূপান্তর

বসন্ত-আবেগ-শ্রান্ত প্রান্তরের 'পরে
নীরবে নামিল সন্ধ্যা ; পুরবীর স্বরে
সকল মুখর ভাষা দিল মৌন করি'।
শান্ত বনচ্ছবি। চন্দ্র কিরণ-পাপড়ি
সহসা খুলিল নভে। স্বপ্নসম সব
ঘেরিয়া ধরিল মোরে নিবিড় নীরব !
জানিনা তখন কার প্রেম আলিঙ্গনে
ছিলাম মগন ; তার নয়নের কোণে
আমার সকল ব্যর্থ বিরহের তান
লভিল পুলকভরে চির অবসান।
প্রভাতে ভাঙ্গিল ঘুম বিহঙ্গের গানে,
মেলিয়া নয়ন মোর হেরি ঊর্দ্ধপানে,
নব জাগরণে ভরি' আকাশের বুক,
সেই বাহু সুকোমল, সেই হাসিমুখ।

যাত্রা

রব দূরে, তবু নহে প্রবাস যাপন,
গৃহ হতে গৃহান্তরে কেবলি গমন।
হে বিশ্ব-গৃহের লক্ষ্মী ! তোমার সংসার
পরিপূর্ণ জলে-স্থলে, নাহি অন্ত তার।
অসীম এ পারাবারে বিম্বসম ভাসি,
কভু দুঃখে কেঁদে মরি, কভু সুখে হাসি !
তোমার মঙ্গল-রূপ সুখদুঃখ মাঝে,
সব ঠাঁই সব ক্ষণে নিয়ত বিরাজে !
তব শিশু নহে বদ্ধ অঞ্চলের ছায় !
উন্মুক্ত বিশ্বের পথ ; যেথা প্রাণ চায়
রয়েছে অবাধ গতি ! তোমার এ দান,
সব বাঁধ টুটি' রবে চির পরিত্রাণ !
গৃহ হ'তে দীন নেত্রে বিদায়ের কালে
হে কল্যাণি ! তব টীকা আঁকি দিও ভালে।

মিলন

শুনেছিনু রূপকথা, রাজবালা কবে কোন্ বনে
ঘুমন্ত নগরী মাঝে সুপ্ত ছিল কুসুমশয়নে।
ছিল যত তরুলতা, যেন বৃদ্ধ তাপসীর মত',
ঝড়ে রৌদ্রে সমভাবে ছিল সব মাথা করি নত।
হেনকালে কোথা হ'তে রাজপুত্র হারাইয়া পথ,
বনেতে প্রাসাদ হেরি', টানি অশ্ব থামাইয়া রথ,
পশিল বনের মাঝে। দেখে যেন হয়ে মন্ত্রাহত,
কে এ অরণ্যের মাঝে বসন্তের ফুলটির মত?
থাকিতে নারিল যুবা; আগ্রহে ধরিল তার কর,
শিহরি' উঠিল বালা; বনেতে ধ্বনিল কুহুস্বর,
চারিদিকে ফুটিয়া উঠিল ফুল, আনন্দেতে
লতা হেলে দোলে,
বনদেবী আসি' সেথা হাসিয়া পড়িল যেন ঢলে'।
মিলন হইল দোঁহে, বারতা হইল আগুয়ান্,
ভাসাইয়া দুইকূল প্রেমের নদীতে এলো বান।
জগতের আদি হ'তে এইরূপ ঘটয়ে প্রমাদ,
সাগরে মিলয়ে নদী বেগভরে, নাহি মানে বাঁধ।
তাহারা মিলিয়া দোঁহে, এমনি জাগায়ে তুলি ধরা,
দোঁহার জীবনপথ করিল গো সুবাসেতে ভরা।

দুইটি হৃদয়

একি এ লীলা প্রেমময়,
ভুবনশাখে জাগালে দুটি পুলকভরা কিশলয়।
তোমার উষা নয়ন পানে
চেয়েছে দোঁহে মুগ্ধ প্রাণে,
বাতাস তব বারতা বহি
দোঁহার প্রাণে কি যে কয়!
ডুবালে আজি কি রসধারে নবীন দু'টি কিশলয়!

বাঁধন নাহি টুটিবে;
হৃদয় দু'টি মিলিয়া গিয়া কুসুম হ'য়ে ফুটিবে।
হৃদয়দেব! পূজার তরে
গন্ধ তার পড়িবে ঝরে,
আপনা ভুলি সে দলগুলি
চরণতলে লুটিবে,
নবীন দু'টি হৃদয় যবে একটি ফুলে ফুটিবে!

অসীম স্নেহে ঢাকিয়ো!
ফুলের পাতে প্রেমের মধু গোপনে ভরি রাখিয়ো!
সুখের দিনে, দুখের রাতে,
মলয় বায়ে, ঝঞ্ঝাবাতে,
কিরণময় বীণার রবে
তোমারি পানে ডাকিয়ো!
প্রেমের মধু রাখিয়ো হৃদে ভরিয়া, তুমি রাখিয়ো!

শরতের গান

আজ্‌কে আমি ধর্‌বো তোমায়,
প্রাণ ভ'রে আজ বাস্‌বো ভালো,
ওগো, ছিন্ন মেঘের খেলার সাথী
মন-ভুলানো পূবের আলো!
ডুবিয়ে মাঠের এপার ওপার
এলোরে আজ কিরণ-জোয়ার!
বিরাম নাইকো পূবে হাওয়ার
ভাস্‌ছে মেঘের ধবল তরী;
যেন রে কোন্ সফল মিলন
বাজায় শঙ্খ গগন ভরি'।
আজ আলো আর মাঠের সঙ্গে
পান্না-সোনার মাখামাখি,
ফুলের গন্ধে, গানের ছন্দে
বিশ্বে প্রাণে ডাকাডাকি!
ভরা ভাদ্রে জলেস্থলে,
নির্ম্মল নীল আকাশতলে,
বর্ষা বিদায় অশ্রুজলে
পড়েছে আজ কি সান্ত্বনা!
কান্নাহাসি গলাগলি
হাওয়ায় করে আনাগোনা।
ধর্‌বো আমি, ধর্‌বো তোমায়,
প্রাণ ভ'রে আজ বাস্‌বো ভালো,
ওগো, ছিন্ন মেঘের খেলার সাথী,
মন-কাঁদানো পূবের আলো!

অবসর

কে বাজালে মোহন বাঁশি!
দুলিয়ে শাদা কাশের রাশি,
ছড়িয়ে দিল শুভ্র হাসি
শারদ নীলিমায়!
ধরার পরে কোমল চরণ
বুলিয়ে গেল সবুজবরণ,
ক্ষেতভরা ধান লুটিয়ে বরণ
কর্‌লো তারি পায়।

পটে আঁকা গাঁয়ের বুকে
আলোছায়া পড়্‌ল ঝুঁকে;
উঠ্‌লো ফুটে সবার মুখে
হাসির কলকল।
আজ সকালে কল্‌সি কাঁখে,
চেয়ে আধেক ঘোম্‌টা ফাঁকে,
সবুজঘেরা দীঘির বাঁকে
চল্‌লো স্নানের দল।

দীঘির জলটি শিউরে উঠে',
হাতের ঘায়ে পালায় ছুটে',
ফিরে ঘিরে চায়রে লুটে
নিতে সরমখানি।
কখন বা সে ছল্‌কে ভুলে
পড়ছে গিয়ে এলো চুলে,
কখন বা দুই বাহু তুলে
আঁচলটি লয় টানি'।

আলোর সোহাগ আন্‌তে কাড়ি',
আকাশে মেঘ দিচ্চে পাড়ি ;
ডানা মেলি' বকের সারি
যাচ্চে যেন উড়ে।
ভুরুর মত কৃষ্ণ রেখা
জলের 'পরে যাচ্চে দেখা ;
আলোক-উজল পথটি বাঁকা
ঐ দেখা যায় দূরে।

মেঘ ও জলের ঢেউয়ের মেলা,
এমনিতর কতই খেলা
খেল্‌ছে আজকে সকালবেলা
ঠিকানা তার নেই !
ছায়ার মায়ায়, আলোর নাচে,
আকাশজোড়া খেলার কাছে
মন হারিয়ে বসে আছে
সকল কাজের খেঁই

প্রতীক্ষা

আছে ওগো আছে !
যা' আছে তা' লুকিয়ে আছে
আমার হিয়ার কাছে !
ইচ্ছে করে বাহির করে'
চাইতে মুখের পানে ;
নয়ন দু'টি করতে কাজল
সোহাগ তুলির টানে ;
গুন্‌গুনিয়ে মনের ব্যথা
শোনাতে তার কাণে।
পারিনা যে—সে কয় কেঁদে
সদাই আমার প্রাণে—
আছে ওগো আছে !
যা' আছে তা লুকিয়ে আছে
আমার হিয়ার কাছে !
বধূরে মোর আন্‌তে যে চাই
ভিতর হ'তে কাড়ি',
শাঁখ বাজিয়ে করবে বরণ
যতেক পুরনারী ;
কইব কত গোপন কথা
মনের কথা তারই,
হায়রে সে কয় করুণ সুরে
মুছে নয়নবারি—
আছি ওগো আছি !
কইব কথা, এম্‌নি রব
হিয়ার কাছাকাছি !

জনশূন্য পথে যখন
বাহির হলেম সাঁঝে,
বনের ধারে জোনাক-জ্বালা
ঝিঁঝি-ডাকার মাঝে ;
সাঁঝের সুরটি ফুটলো যখন
তারার মোহন সাজে,
আমার হিয়ার তন্ত্রী তখন
গুম্‌রে গুম্‌রে বাজে—
আছে ওগো আছে !
বিরহের গান গাচ্ছে বসে
তোমার হিয়ার কাছে !
বধূ আমার লুকিয়ে আছে
গোপন হৃদয়পুরে ;
কেমন করে নাব্‌বো সেথা
সে যে অনেক দূরে !
খুঁজে আমি পাই না তারে
মর্‌ছি মিছে ঘুরে !
শুন্‌ব কবে বাজ্‌বে যবে
বীণা মিলন সুরে—
আছি ওগো আছি !
আমার কণ্ঠে দাও পরায়ে
তোমার মালাগাছি

বর্ষশেষ

কর্ম্ম-ক্লান্ত বৎসরের শেষ রশ্মি-শিখা
অস্ত গেল ! উর্দ্ধে হের কার অনামিকা
অঙ্গুলি ফিরিল আজি পূর্ব্বাচল পানে।
আজিকার বিদায়ের রাত্রি অবসানে
অতিথি আসিবে দ্বারে ! তারি তরে হিয়া
আকুল-বিস্ময়ভরে আছে প্রতীক্ষিয়া !
সারা বিশ্বে অশ্রুঘেরা স্তব্ধ আয়োজন
শেষ অর্ঘ্য রচিবারে। ওগো পুরাতন !
নিত্য নব নবরূপে তোমার প্রকাশ,
চিরন্তন লীলা, মাঝে নাহি অবকাশ,
তবু বিশ্ব মিলনের পূর্ণতার তরে
বিদায়ের অশ্রু ঢালে ঋতু সম্বৎসরে।
সব শূন্য করে আমি রচি দিনু স্থান,
ব্যর্থআশা জীবনের চরম সম্মান।

নববর্ষ

কল্যাণের শুভস্পর্শে হোক্ সুপ্রভাত,
ভগ্ন হৃদয়ের দ্বারে পুণ্য-রশ্মি-পাত !
দীপ্ত নীলাম্বরে আজি পূর্ণ মহিমায়
প্লাবিয়া নিখিল বিশ্ব কি আনন্দ ভায় !
সারা বর্ষ খেলিয়াছি স্বপনের খেলা ;
যারে চাহি তারে শুধু করি অবহেলা !
সংশয় করিতে দূর জালে পড়ি' ধরা,
রুদ্ধ ঘরে ছিনু বসে অন্ধকারে ভরা।
দূর কর আজি প্রভু মায়া-কুহেলিকা !
জ্বালাও, জ্বালাও চিত্তে নব-দীপ-শিখা !
সব দ্বন্দ্ব ঘুচি' পথ হউক্ সরল,
মুক্ত কর, এ কঠিন স্বার্থের শিকল।
নব প্রাণ সঞ্চারিত হোক্ ধরাতলে,
ঝরুক্ অমৃত-ধারা তব জলেস্থলে !

বর্ষার গান

বাজেরে বাজে হিয়ার মাঝে
বাদল-ঝরা গান ;
মেঘের সাথে মিলেছে রাতে
সকল মনপ্রাণ।
শ্রাবণ ঘন, নিবিড় নিশা,
না হেরি পথ, না পাই দিশা,
জানি না আজি উঠেছে বাজি
কাহার আহ্বান !
হৃদয়-তীরে ধ্বনিয়া ফিরে
বাদল-ঝরা গান।

আপন মনে নিভৃত কোণে
জ্বালায়েছিনু বাতি ;
সহসা কেন নীপের শাখে
উঠিল বায়ু মাতি !
তখনি দীপ নিবায়ে দিয়া,
পরশ কার লভিল হিয়া !
দেখিনু যারে, বরিনু তারে
চিরজনম সাথী ;
সহসা কেন পিয়াল বনে
পবন উঠে মাতি।

আমার গান আঁধার প্রাণে
দুয়ার খুঁজি ফিরে,
পথ না পেয়ে, নয়ন বেয়ে
ঝরিছে আঁখি নীরে !
কাজল-কালো বেদনা টুটে
খনে খনে সে চমকি' উঠে,
অনল-ঝলা' বিজুলী-ফলা
হৃদয় চিরে চিরে।
আমার গান ফাটিয়া পড়ে
আকুল আঁখিনীরে !

কাহার তরে একেলা ঘরে
জাগিয়া রহে মন !
আকাশ পরে খুঁজিয়া মরে
কাহার দরশন !
পরাণ কার চরণ-পাতে
কাঁপিয়া উঠে গভীর রাতে ?
কাহার ব্যথা বহিয়া আনে
বাদল-বরিষণ ?
কাহার তরে একেলা ঘরে
জাগিয়া রহে মন ?

শরৎ সভা

আজি এ প্রভাতে শরৎ সভায়
বিশ্বের ডাক পড়েছে,
তাই বুঝি নিরালায় বসি এই
সোনার মুকুট গড়েছে।
তারি আভা মোর নয়নের পরে
ধারাসম আজ পড়িতেছে ঝরে ;
সে পরশমণি ধরণীর বুকে
সকলি যে সোণা করেছে।
শুনিতেছি তাই শরৎ-সভায়
বিশ্বের ডাক পড়েছে।

দিকে দিকে তাই পুবের বাতাস
বারতা বহিয়া ছুটেছে,
পথে যেতে সে যে শিউলি বনের
মর্ম্মের কথা লুটেছে।
শতদলমধু-লুব্ধ ভ্রমর
গুঞ্জন-রত পেয়েছে খবর
অমল হৃদয় মেলেছে কমল
ঘুমঘোর তার টুটেছে।
তাহারি আভাস বহিয়া পুবের
বাতাস আজিকে ছুটেছে।

মীড়ে ধীরে কভু গমকে গভীরে
আকাশের বীণা বাজে গো,
তালে তালে তার নাচিছে বিশ্ব
আলোক ছায়ার সাজে গো।
শুনি তটিনীর মঞ্জীর রব
শ্যামল দু'কুল স্তব্ধ নীরব,
পুলকি উঠিছে পরাণ তাহার
নয়নে কি হাসি রাজে গো।
মীড়ে ধীরে কভু গমকে গভীরে
আকাশের বীণা বাজে গো।

এসেছে আজি এ শরৎ সভায়
সকল বিশ্ব এসেছে,
বন্যার স্রোতে অযুত তরণী
নব আনন্দে ভেসেছে।
আকাশ ধরায় আজি কানাকানি,
প্রাণে প্রাণে আজ হলো জানাজানি,
তাই দোঁহে আজি এমন পূর্ণ
মিলনের হাসি হেসেছে।
শরৎ-সভায় এসেছে আজিকে
সকল বিশ্ব এসেছে।

অন্তরের ধন

ধরি ধরি করে, ছুটি আলেয়ার পানে,
যত যায় সরে, তত নিকটে সে টানে!
হেলায় দুর্গম পথ হয়ে যাই পার,
ত্বরিতে তরিয়া দুস্তর পারাবার!
ছুটিয়া চলেছে, তার নাহি শ্রান্তিলেশ,
আলেয়ার পানে রাখি আঁখি অনিমেষ।
সকলি আঁধার, শুধু এই আলোটুকু
মুমূর্ষুর প্রাণসম করে ধুকু ধুকু।
ঐটুকু আলো যদি কভু নিবে যায়,
গতি তার হয় স্তব্ধ, সকলি হারায়।
অনন্ত আলোকধারা অন্তরের মাঝে,
নিবাত নিষ্কম্প দীপ্ত সুচির বিরাজে,
ফিরে ছাখ্, ফিরে ছাখ্ তারি পানে মন,
সেই নিরন্তর চির জ্যোতি-প্রস্রবণ।

বাসনা

কণ্ঠ চাহে করিতে গান,
হৃদয় চাহে করিতে দান
কেবলি ভালবাসা।
নয়ন ফিরে দরশ মাগি,
বাহু সে শুধু পরশ লাগি
রেখেছে চির আশা।

চিত্ত যাচে পিপাসাতুর,
পদ-পরশ-রস মধুর,
শুধু ক্ষণেক তরে,
পরাণ চাহে পাত্রে তার
ভরিতে যেই সুরভিসার
অঙ্গ হতে ঝরে।

একটি শুধু যামিনী তরে,
সকলি মোর কাঁদিয়া মরে
চাহিয়া পথ পানে,
তন্দ্রাহীন নীরবতায়
আঁধার নিশি ডুবাতে চায়
শুধু একটি গানে।

একটু প্রেম, একটি মালা,
একটু তার দহন-জ্বালা
গভীর বেদনার।
একটু শুধু জ্যোছনা-পাশ,
দখিন-বায়-দীর্ঘশ্বাস
চিত্তে আপনার।

এমনি প্রিয়া মধুর সাজে
নামিবে কবে এ হিয়া মাঝে,
চরণ ফেলি ধীরে।
অন্তহীন সে অভিসার
রচিবে কবে বিরাম তার
আমার এই তীরে।

গান

প্রভু, মুছাও আঁখিবারি,
কৃপাভিখারী তব দ্বারে !
ফিরায়োনা, রেখোনা আর এ
অন্ধ কারাগারে !
আজি আলোক উৎসবে
একি অলোক সৌরভে
ভাসিল ধরা, তব বিমল
অমৃত রসধারে !

শ্যামল তৃণে পুষ্পবনে
ফুটিল একি হাসি !
গগন জ্যোতিমগন হল
তিমির ঘন নাশি !
এ অন্তরে শূন্য ঘরে,
নিরাশা কেন কাঁদিয়া মরে ;
আশার বাণী শুনাও, লহ
আঁধার পরপারে।

কবে

কবে সকল বাঁধন ছিঁড়ে তোমার
মুক্ত হাওয়ায় প্রাণ জুড়াব !
কবে সকল ধুলা ঝেড়ে তোমার
চরণধুলা মাথায় পাব !
কবে আমার হিয়ার মাঝখানেতে,
তোমার আসন রাখ্‌ব পেতে।
কবে সকল বোঝা নামিয়ে দিয়ে
পরম প্রেমে প্রাণ পুরাব !
কবে আমার মনের আঁধার কোণে
উঠ্‌বে জ্বলে তোমার বাতি !
কবে মহানন্দে ডুবিয়ে দেবে
আমার দিবস, আমার রাতি !
কবে জীবনতরী তোমার কূলে
লাগ্‌বে গিয়ে চরণমূলে,
কবে পারের হিসাব চুকিয়ে দিয়ে
হাটের খেয়ার কূল ভিড়াব ?

গান

বেহাগ

জাগ জাগরে, হের অন্তরে
হৃদিগগন মাঝে !
জাগ্রত অনন্ত প্রেম-
চন্দ্রমা বিরাজে !
লহরে চিত ভরিয়া
পড়ে অমৃত ঝরিয়া ;
সকল ভুলি, দুয়ার খুলি
এস মধুর সাজে !

ফুটিল একি মাধুরী
নিখিল রস-সরসে
চিত-মধুপ সুধা-লোলুপ
গুঞ্জরিল হরষে !
কাহার বীণাযন্ত্র
বাজায় প্রেমমন্ত্র,
অসীম নভ পূর্ণ করি
বাজে নীরবে বাজে।

বেদনা

ব্যথা জাগে অন্তরে,
কোন আলোকের পরশ মাগি
অন্ধ হৃদয় কন্দরে।
কোন প্রভাতের অরুণ হাসি
নয়নে মোর উঠ্‌বে ভাসি,
মিলিয়ে দিয়ে আঁধার রাশি
ঘুচাবে সব দ্বন্দ্বরে।

কোন প্রেমে আজ সাজ্‌ব গো !
কি চন্দনের গন্ধভরে
অঙ্গ আমার মাজ্‌ব গো!
মোর তরী কোন স্রোতের টানে
ভেসে যাবে অকূল পানে ;
কোন বাতাসে বাজ্‌বে গানে
চিত্তবাঁশীর রন্ধ্রে !

অপরিচিত

কোন সাগরের জোয়ার আসে
কে জানে, কে জানে!
ভাস্‌ল তরী দূর আকাশে
কার পানে, কার পানে!
বাদল ধারা কার সে প্রেমে,
কি গান গেয়ে আসে নেমে!
ফলে ফুলে হাসে ধরা
কার দানে, কার দানে!

কোন সুদূরে কোথায় সে তীর,
কোন খানে, কোন খানে?
মোর বাণী আজ সজল সমীর
কয় কানে, কয় কানে।
মোর নয়নের পলক ছেয়ে
অশ্রুধারা পড়ে বেয়ে,
কাহার বীণা বাজ্‌ল হোথা
কোন তানে, কোন তানে?

নিরাশের আশা

একটি গানে কইব প্রাণের কথা,
পারি না গো, তাও যে পারিনা!
একটি সুরে বাজ্‌বে মনের ব্যথা,
পারি না গো, তাও যে পারি না।
একটি প্রাতে নবীন কুসুম তুলে
দিব ঢেলে ঐ চরণের মূলে
হৃদয়দলের সবগুলি দল খুলে,
পারি না গো, তাও যে পারিনা।

এমন আশা কে জাগাল মনে,
হারি না গো, তবুও হারি না।
নামে আঁধার কোন অশুভক্ষণে,
হারি না গো, তবুও হারি না।
তবু বীণায় বাঁধতে যে চাই সুর,
জাগে পরাণ বিরহবিধুর,
আভাস পেয়ে ধায় হৃদয় সুদূর,
হারি না যে, তবুও হারি না।

সঙ্কোচ

টোড়ি—ঝাঁপতাল

যদি এ মনে সঙ্গোপনে
শুনাও তব বাণী,
তবুও ঐ পুণ্য নাম
কেমনে মুখে আনি !
আসিবে যদি চরণ ফেলে
সকল বাধা দু'হাতে ঠেলে,
কেমনে প্রভু চরণ তবু হৃদয়ে লব টানি !
তোমার ঐ পুণ্য নাম কেমনে মুখে আনি !

কেবলি ভয়ে নিজেরে স্মরি,
দূরেতে সরে যাই ;
নিয়ত মোরে অভয় দিতে
নিকটে এসো তাই !
যতই বলি নাহি যে কেহ,
ততই তব বাড়ে যে স্নেহ ;
তোমারে যেই জানেনা, তারে আপনি
লহ জানি !
তোমার ঐ পুণ্য নাম কেমনে মুখে আনি !

পরিপূর্ণতার রূপ

সারাটি রজনী মোর নিদ্রা নাহি ছিল দু'নয়নে,
সুদূর প্রান্তর ব্যাপি, আমার এ নিভৃত শয়নে
পশেছিল জোছনার স্নিগ্ধ মৃদু পরশ কোমল,
হৃদিসরোবর মাঝে তারি প্রতিবিম্ব নিরমল
জাগায়ে তুলিল তাহে অপরূপ মূরতি মধুর !
ছিন্নতন্ত্রী বীণা মোর আজি কেন বিরহবিধুর
নিমেষে উঠিল বাজি ! কতবার এসেছিল দ্বারে,
যুগযুগান্তের কথা এনেছিল বহি' ভারে ভারে ;
কত সুখস্মৃতি তার, কত আশা কত জাগরণ ;
চাহিনি ত ফিরে আমি, করি নাই তাহারে বরণ,
কহি নাই কোন কথা ! সহসা কি পরিচয়ে আজি
মুখর এ হৃদি-তন্ত্রী শত রাগিণীতে উঠে বাজি ?
সমুখে রয়েছে পড়ি শ্যামকান্ত ফল-পুষ্পে ভরা
চন্দ্রকিরণ-রসবিহ্বল মূরছিত ধরা !
আমি ত একেলা নহি ! এরও আজ ব্যথা বাজে বুকে ;
আজিকে সবার সাথে পরিচয় সব দুঃখেসুখে !
চিত্ত মোর কাঁদি কহে—এ রজনী আজিকে সফল !
চির-পরিপূর্ণতার হের এই রূপঃসুবিমল !

আশা

কোথা জ্বালা জুড়াবার ঠাঁই ! কোথা অতল সলিল !
কোথা সেই চির-প্রেম-রস-ধারা পূত, অনাবিল !
বেলা যায়, বেলা যায়, এ গাগরী ভরিল না আজ !
দিনান্তে বসিয়া ভাবি, হোলোনা যে দিবসের কাজ !
কলহাস্য-মুখরিত গ্রামপথে যাত্রী চলে যায়,
সে রব শ্রবণে পশি' চিত্তমাঝে করে হায় হায় !
অশ্রু-ঘেরা নয়নের একপ্রান্তে ফোটে তবু হাসি,
যাওয়া নাহি হ'ল, তবু চিত্ত বলে 'যেতে ভালবাসি'।
আজিকার এ যামিনী সফল করিনু দীপ জ্বালি,
কাল দিবসের শেষে এ গাগরী নাহি রবে খালি ;
কানায় কানায় ভরি' উছলি' পড়িবে রসধার !
ছাড়িতে চাহেনা মন এইটুকু গর্ব্ব আপনার।
আজিকে এ অলঙ্কারে, এ বসনে ঢাকি দৈন্য লাজ,
আছি আশা ধরে কবে আসিবেন সে রাজাধিরাজ !

হৃদয়-স্বামী

ভিখারী কহে তোমারি দ্বারে
এসেছি কতদিন,
গেয়েছি কত দুখের গান
তবুও উদাসীন ?
ধনী সে বলে কত না ধন
রেখেছি তোমা লাগি ;
স'পিব বলে দিবসনিশি
রয়েছি আমি জাগি।
জ্ঞানী সে বলে খুঁজিয়া সারা
দেখা যে নাহি পাই ;
যতই বলি হয়েছে শেষ—
অন্ত দেখি নাই !
ক্ষ্যাপা সে বলে আপনা-হারা
ঘুরিয়া পথে পথে,
কাঁদিয়া মরি, নিদয় তবু
আসেনা কোনমতে !
বধূ সে বলে, হে প্রিয়তম।
কেবলি আঁখিজলে
সিক্ত করি নীরবে আজ
গেঁথেছি ফুলদলে !
বাসর-নিশি পোহায়ে যায়,
আসিবে কবে নাথ !
গোপনে মনে কে বলে তারে—
'রয়েছি তব সাথ।'

সন্ধান

কেঁদে কেঁদে ফিরে গহনে গহনে প্রাণ,
খুঁজে হয় সারা, নাহি পায় সন্ধান।
উষার উদয়ে, নিশার তিমির তলে,
সুখের পুলকে, দুখের নয়ন জলে,
বনমর্ম্মরে, নির্ঝর কলকলে
ধ্বনিত বিপুল তান,
তারি মাঝে শুধু ব্যাকুল পরাণ মোর
খুঁজে হয় সারা, নাহি পায় সন্ধান।

কার লাগি এই বিশ্বসভার দ্বারে
জনম মরণ আসে যায় বারে বারে?
কত খেলা হল কত না পথের শেষে,
কত কাল ধরে ভ্রমিল কত না দেশে,
কখনো সেজেছে দীনদরিদ্র বেশে,
কখনো রতনহারে।
আলোকে আঁধারে ঘুরিতে ঘুরিতে শুধু
জনম মরণ আসে যায় বারে বারে।

আপনারে খুঁজে কে আপনি দিশাহারা,
দূরে চলে যায়, চোখে বহে জলধারা।
জানেনা জানেনা নিখিল ভুবন মাঝে
তারি আপনার পরম আপন রাজে,
বিশ্ববীণায় তাহারি বিরহ বাজে,
বিপুল গানের ধারা!
সকল দৃশ্যে, সব সঙ্গীত তালে
আপনারে খুঁজে কে হলরে আজ সারা!

নেহদং যদিদমুপাসতে

আঁখির দুয়ারে আলো আসি বলে
মোরে বরে' লও, বরে' লও,
অন্তর মোর তারে দেখি বলে
ওগো তুমি নও, তুমি নও!
হৃদয়-কবাট খুলে বায়ু বলে
মোরে স্থান দাও, স্থান দাও,
মন বলে 'দূত, প্রভুর আদেশ
শুধু বলে যাও, বলে যাও!'
সলিল বলিছে 'শীতল বক্ষে
এস ডুব দাও, ডুব দাও।'
চিত্ত কহিছে—রসের আধার
সে যে, তারে চাও, তারে চাও!
নীলিমা বলিছে গগন ছাইয়া
নেহারো রূপ অপার!
মনে বাজে বেণু অরূপের রূপ
সকল রূপের সার!
এমনি সকলে আসে যায় নিতি
বলে 'বরে' লও, বরে' লও।'
কারে চাহে মন নাহি জানে, বলে
—ওগো তুমি নও, তুমি নও!

স্বপ্রকাশ

আপন বসন্তরাগে যেথা তুমি পূর্ণপ্রস্ফুটিত,
সেথা নাহি দখিন পবন !
নিঃশব্দ বীণায় তব যেথা জাগে সমাপ্ত সঙ্গীত,
সেথা নাহি কাকলী কূজন !
অনন্ত মিলন সেথা, চির ভালবাসা,
যেথা স্তব্ধ গুঞ্জরণ, নাহি যাওয়া আসা,
বিরহদহন নাহি, নাহি লুব্ধ আশা,
নাহি স্বপ্ন, শুধু জাগরণ !

যেথা তব তন্দ্রাহীন আঁখি জাগে দিনরাত্রি পারে,
সেথা নাহি ক্ষণ-চন্দ্রলেখা !
যেথা পদপ্রান্তে তব চির-মেঘমুক্ত রক্ত-রাগ,
সেথা নাহি উষারুণরেখা।
নাহি দীপ্তি ক্ষণিকের, নাহি অন্ধকার,
চির তৃপ্তি, নাহি অতৃপ্তির হাহাকার।
আছে মুক্তি, নাহি সেথা বন্ধন-বিকার ;
নাহি সঙ্গী, নই সেথা একা !

চির পরিচিত

বঁধু
তোমার সাথে দেখা আমার
গ্রামের পথে যেতে,
শিউলি বনের গন্ধে যেথায়
পবন উঠে মেতে !
কচি ঘাসের বুকের 'পরে
যেথায় শিশির-অশ্রু ঝরে,
সোনার ধানের শীর্ষ যেথায়
দুলচে ভরা ক্ষেতে ;
তোমার সাথে দেখা আমার
সেথায় পথে যেতে !

বঁধু
সকালবেলা সেথায় কত
খেলা তোমার সনে,
আলোর লুকোচুরী যেথা
আমলকীর বনে !
বাতাস যেথা পাতার 'পরে
নৃত্যঘোরে লুটিয়ে পড়ে,
ফুলের মধু ভ্রমর যেথা
লুঠ করে গোপনে ;
সকালবেলা সেথায় কত
খেলা তোমার সনে !

বঁধু
দিনের হাটে তোমায় আমায়
কতই বেচাকেনা!
শোধ হলনা এক কড়িও
রইল কেবল দেনা!
হবে না শোধ, হবে না যে
সেই বেদনা প্রাণে বাজে
চিরদিনের ঋণী বলে
রইনু তোমার চেনা!
দিনের হাটে তোমায় আমায়
কতই বেচাকেনা।

বঁধু
গোধূলির ঐ ধূসর ছবি
আঁকা যখন হবে,
সন্ধ্যাবেলা পারে যাবার
সময় আসে যবে!
শেষ হবে সব বিকিকিনি
ঋণের পরে হব ঋণী
খেয়ার কড়ি আপনি দিয়ে
নায়ে তুলে লবে!
সন্ধ্যাবেলা পারে যাবার
সময় যখন হবে!

কে জাগে!

মেলিয়াছে আঁখি প্রভাতের পাখী
গাহে বন্দনা গান!
পুষ্পিত শাখা উষারুণ মাখা
বিরচে অর্ঘ্যদান!
করুণ-ললিত রাগে
স্বর্ণ-বলয়-শিঞ্জিত-বাহু
কে জাগে! কে জাগে!

আলোক ধারায় আজি কে দাঁড়ায়
আঁধারের পরপারে!
শুভ-পরশন রস-বরষণ
বিশ্বের দ্বারে দ্বারে!
হের ভৈরবী রাগে
শুভ-সিন্দুর-শোভিত ললাটে
কে জাগে! কে জাগে!

সুনীল বিথার অঞ্চল কার
অসীম শূন্যে লুটিয়া!
চরণপ্রান্তে আছে একান্তে
রক্ত কমল ফুটিয়া।
বিমল প্রভাতী রাগে
বিশ্বকমল করি টলমল
কে জাগে! কে জাগে!

মুক্তবন্ধ চেতনছন্দ
ভাসিছে মন্দ পবনে !
ঘুচায়ে দ্বন্দ্ব জাগে আনন্দ
বিশ্ব ভবনে ভবনে !
হের প্রশান্ত জাগে অনন্ত
সবার চিত্ত গগনে !
হের ভৈরব রাগে
আলোক আঁধার করি একাকার
কে জাগে ! কে জাগে !

সান্ত্বনা

মোর মনপাখী গাহে থাকি থাকি
হোলো না, হোলো না, হোলো না !
ওগো বিহঙ্গ ! মেলো মেলো আঁখি,
ও কথা বোলো না, বোলো না !
আকাশে চাহিয়া খুঁজিতেছ কারে,
যারে চাও সে যে পিঞ্জরদ্বারে,
এই গান গেয়ে ডেকে বল তারে
খোল খোল দ্বার, খোল না !
ওগো বিহঙ্গ ! মেলো মেলো আঁখি,
ও কথা বোলো না, বোলো না !

চিত্তবাঁশরী কাঁদিছে ফুকারি,
বাজে না, বাজে না, বাজে না !
আজি হের দ্বারে অতিথি ভিখারী,
কান্না সাজে না, সাজে না !
শুনাও তাহারে দু'টি সাধা গান,
যা আছে গোপনে, তারে কর দান,
তারপর হয় হোক্ অবসান,
তাতে যেন মন লাজে না !
আজি হের দ্বারে অতিথি ভিখারী,
কান্না সাজে না, সাজে না !

প্রাণবঁধু হায় এসে চলে যায়
রয় না, রয় না, রয় না !
মিছে হায় হায়, ফাগুনের বায়
সদাই বয় না, বয় না !
এসেছে যে আজ তারে যেতে দাও,
নূতন সুরেতে বাঁশী পুরে নাও,
যা করেছ দান, ভরে আছে তাও
অন্তরে, সেত ক্ষয় না !
মিছে হায় হায়, ফাগুনের বায়
সদাই বয় না, বয় না !

চিত্তকমল আঁখি ছল ছল
ফোটে না, ফোটে না, ফোটে না !
চিরদিন অলি মধুকুতুহলী
জোটে না, জোটে না, জোটে না।
আসে মধুমাস শুভ অবসর,
ফুলে পল্লবে মেলি অন্তর
যে বারতা বহি আনে পিকবর
চিরদিন তাহা রটেনা।
চিরদিন অলি মধুকুতুহলী
জোটেনা, জোটেনা, জোটেনা !

জ্যোৎস্না

নির্ব্বাক অন্তর মোর উঠিছে শিহরি ;
স্থির মুগ্ধ দু'নয়নে অশ্রু পড়ে ঝরি' !
এ যে সুধাগরলের অপূর্ব্ব মিলন !
একি এ তাণ্ডব নৃত্য, একি আলোড়ন !
বিশ্বসিন্ধু বিমন্থিত উগারে গরল
ধরণীর দুঃখসুখ ; শুধু অচঞ্চল
জাগ্রত রয়েছে হের সুধাপাত্র হাতে
কোন শুভ্র দেবীমূর্ত্তি স্নিগ্ধ মহিমাতে !
ঝরিতেছে ধারাসম জোছনা নিঝর্র,
ব্যথিত এ বক্ষ মোর পুলক-জর্জ্জর !
এমনি জননি, হও অন্তরে উদয়
পরিপূর্ণ সুধারসে সব হোক্ লয় !
লভি নিত্য চিত্তে তব অমৃত আস্বাদ—
কর আশীর্ব্বাদ এই, কর আশীর্ব্বাদ !

প্রেমের ভাষা

ভালবাসো জানি তাহা, প্রাণ চাহে বল—'আহা
প্রেয়সি তোমারে ভালবাসি !'
এই কথা প্রাণ ভরে শুনিতে দিওগো মোরে,
এ পরাণ চির উপবাসী !
সার্থক সে মালা গাঁথা মিলনের সুরে বাঁধা
বাজে যবে সাহানার তান,
বরষা ঘনায়ে আসে বিরহী নয়নে ভাসে
মল্লার-সজল অভিমান !
করুণ পূরবী রাগে ব্যাকুল বেদনা জাগে
পরিপূর্ণ বিদায়ের সুরে,
পূর্ণিমার আঁখি পাতে যামিনী মিলনে মাতে
বেহাগে সে গীত উঠে পূরে !
নদী সে বহিয়া যায় মিলনের বাসনায়
অন্তরে ধ্বনিত সারিগান,
সাগরের বক্ষে গিয়া পরজে গরজে হিয়া
তরঙ্গিত গীত দিনমান !
পুষ্পের পরাণমাঝে বাতাসের বাঁশী বাজে
যখন সুরভি করে দান,
বৃক্ষপল্লব ছাপি উঠিতেছে কাঁপি কাঁপি
সুরে তার মর্ম্মরিত প্রাণ।
তাই বলি—ওগো প্রিয় সাহানায় বেঁধে নিও
আমাদের মিলনের বাঁশী ;
ভালবাসো জানি তাহা, প্রাণ চাহে বল 'আহা
প্রেয়সি তোমারে ভালবাসি।'

দুটি তার

বিশ্বযন্ত্রে একটি মন্ত্রে
বাঁধা আছে দু'টি তার,
বাজিতেছে তায় জীবনের সুর
মরণের ঝঙ্কার।
দুটিতে মিলিয়া বাজে এক গান
যুগে যুগে বাজে, নাহি অবসান
আদি ও অন্ত জুড়ি দিনমান
ধ্বনিত সে ওঙ্কার!
বাজিতেছে তায় জীবনের সুর
মরণের ঝঙ্কার!

জীবনের সুর ধেয়ে চলে যায়
মরণের ধায় পাছে,
মাঝে নাহি তার কোন ব্যবধান
একই টানে বাঁধা আছে।
দ্যুলোক ভূলোক গাহে সেই গীত
বিশ্বহৃদয়-নিঃস্যন্দিত
কত বিচিত্র সুর কম্পিত
একটি ছন্দে নাচে;
মাঝে তার নাহি কোন ব্যবধান
একই টানে বাঁধা আছে।

বিশ্বযন্ত্রে একটি মন্ত্রে
বাজিতেছে দু'টি তার,
জীবন মৃত্যু—আদি ও অন্ত,
তোলে এক ঝঙ্কার।
বাজিছে চন্দ্রতপনতারায়
বাজিছে আঁধারে আলোকধারায়
মুক্তির মাঝে বাঁধন কারায়
ধ্বনিত সে ওঙ্কার!
জীবন মৃত্যু—আদি ও অন্ত
তোলে এক ঝঙ্কার!

মানসী

হে মানসি মনপুরে আছ সবটুকু জুড়ে
তবু নাহি হেরি রূপ তব,
বাহির হইতে ছানি আনিতেছ বক্ষে টানি
রূপ রস গন্ধ নব নব।

আপনি দাও না ধরা তবু এই বসুন্ধরা
চরণে লুটিয়া পড়ে আসি,
কি মোহের ইন্দ্রধনু রচিল অরূপ তনু
মূরছিত তাহে রূপরাশি!

শ্রাবণে আকুল ঝড়ে কুন্তল লুটায়ে পড়ে
চমকে চাহনি বিজলীতে;
বরষার ধারে তার বিগলিত বেদনার
কি মূরতি নারি যে লখিতে।

শরতে সুনীল নভে শব্দহারা গীতরবে
জোছনার মূর্চ্ছনা বাজে।
আলোতে ছায়াতে মেশা মদির স্বপ্নের নেশা
স্খলিত বিহ্বল তারি মাঝে।

বসন্তের আগমনে মঞ্জু গুঞ্জরিত বনে
কুসুমের পরাগ সৌরভে,
বকুলশাখার কোলে তোমার ঝুলন দোলে
পল্লবমর্ম্মর কলরবে।

নিত্যনবীন রূপে এই মত চুপে চুপে
ভরিয়া উঠিছ তুমি মনে,
বিচিত্র সে গীতধারা পদতলে পথহারা
বিজড়িত নূপুরনিক্কণে !

মোর অন্তঃপুরে হেরি হৃদয়গগন ঘেরি
তারার আরতিশিখা জ্বলে,
সব মধুগন্ধভার নিঙাড়ি ঢালিছ সার
আমার এ চিত্তশতদলে।

সবখানে বিশ্বমাঝে বাহিরাও কত সাজে
তবু নাহি হেরি তব রূপ,
কেবল রয়েছে জানি ভরিয়া হৃদয়খানি
মানস-মূরতি অপরূপ !

সহজ শোভন

এই চামেলী ফুলের মত
সুধু সৌরভে মাখা ফুটে থাকা হোক্
মোর জীবনের ব্রত !
নাহিক ভাবনা কেন ফুটে আছে
আপনি পূর্ণ আপনার কাছে
প্রভাতের পানে আঁখি মেলিয়াছে
জ্যোতিঃসুধা পানে রত।

যেন অমনি শুভ্রতায়
আজি অনাবৃত করি হৃদয় আমার
দলগুলি খুলে যায়
সরল সহজে আলোকে বাতাসে
শ্যামল স্নেহের বক্ষের পাশে
সব বাঁধা টুটি আপনা প্রকাশে
সফল পূর্ণতায় !

যেন এমনি ধরণী পরে
ধীরে দিন অবসানে ক্ষীণ জীবনের
চ্যুতদলগুলি ঝরে !
যেন এ ক্ষণিক বাঁধনের ডোর
একে একে সব টুটে যায় মোর,
পরাণ অমৃতগন্ধবিভোর
মরণেরে লয় বরে' !

প্রকৃতির রূপ

প্রথম তোমার কোলে এসেছিনু যবে
হে মাতঃ প্রকৃতি! অর্থহীন কলরবে
চেয়েছিনু মুখপানে কেন নাহি জানি
তুমিও শুনাতে মোরে অর্থহারা বাণী,
বিগলিত স্তন্যসুধা করাইতে পান
পরিপূর্ণ স্নেহের সে অযাচিত দান!
লভেছিনু ও অঞ্চলে একান্ত নির্ভর
ওই বক্ষ মাঝে চির অমৃত নির্ঝর!
যৌবনের দ্বারে আসি সহসা দাঁড়ালে,
পরিচিত স্নেহভরে দু'হাত বাড়ালে,
সেই মুখ, সেই হাসি আনিয়াছ সাথে
সেই অচঞ্চল দৃষ্টি তব আঁখিপাতে!
সেই তব অর্থশূন্য নিঃশব্দ সঙ্গীত
তোমার বিপুল যন্ত্রে আজিও ধ্বনিত!

নিরঞ্জন

কেবলি তোমার রূপের ছটায় যদি
থাকিতে আমার সম্মুখে নিরবধি,
ভেবে মরিতাম কোথায় তোমারে রাখি!
তৃষিত পরাণ চাহিত না কিছু আর
মরিত সে মহা লজ্জায় আপনার
গোপনে আঁধারে রহিত সে মুখ ঢাকি।

কেবলি যদি সে তোমার অসীম শক্তি
জাগাত পরাণে আমার সভয় ভক্তি,
তাহলে মোদের মিলন ঘটিত না যে।
রুদ্রদীপ্তি সাগরে হতেম হারা
স্তম্ভিত হিয়া পেতনা কূলকিনারা,
আপন দৈন্যে ডুবিত অকূল মাঝে!

তোমার যন্ত্রে কাঁপায়ে তন্ত্রীরাজি
সরবে গভীর বাণী যদি উঠে বাজি
কে তবে তাহার মর্ম্ম লইবে বুঝি?
তোমার বীণার গভীর বিশ্বপ্লাবী
সে নীরব বাণী খুলিয়া গোপন চাবি
অন্তর মাঝে লভিবারে মরে খুঁজি।

হে নিরঞ্জন, আপনা গোপন করি
দিতেছ সকলি, লভি তাই প্রাণ ভরি,
কেমনে দিতেছ, কি যে দাও নাহি জানি।
হে শক্তিমান, আপন শক্তি হরি,
প্রেমময়, কি আনন্দ মূরতি ধরি
সরস হরষে ভরেছ ভুবনখানি।

শেষ রক্ষা

তোমার চিত্র আঁকতে গিয়ে
রঙ্ মাখিয়ে নিই তুলি,
একটি রঙে ডুবিয়ে নিতে
বারে বারে যাই ভুলি।
শেষ হয়ে যায় আঁকা যখন
হয়না দেখি মনমত,
তবু আমি নিপুণ শিল্পী
তোমার কাছে অন্ততঃ।
তোমার কাব্য পড়ে যখন
আপন মনে মিল গাঁথি,
তোমার ভাবে, তোমার ভাষায়
তোমার ছন্দে ইত্যাদি ;
একটা ছন্দে আট্‌কে পড়ি
লেখা যে শেষ হয় না তাই,
সেটা তুমিই সাঙ্গ কর
যশের ভাগটা আমিই পাই !
তোমার সুরে মিল করে সুর
গাইতে চাই যে একসাথে,
সবগুলো গান হয় যে শেখা
গোল বাধে ঐ একটাতে।
গাইনা তাইত মনের দুখে
শুন্‌চি কেবল তোমার গান,
তোমার সভায় স্থান তবু পাই
এইটুকুই যা আমার মান।
সাজাই যখন গৃহ আমার
তোমায় আন্‌ব পণ করে,
পুলক আমার জেগে উঠে,
গভীর আশা অন্তরে।
তোমার আসন পাত্‌ব কোথায়
এত যে সাজসরঞ্জাম,
এতদিনেও হলোনা তাই
পূর্ণ আমার মনস্কাম।
প্রাণপণে তাই যা কর্‌তে যাই
একটু কেবল রয় বাকি,
তুমিই বল সেটা আমার
অক্ষমতা—নয় ফাঁকি !
সে আশ্বাসে ভরেছে মন
কিছুতে হার মান্‌বে না ;
কি সাধ আমার জান্‌ছ তুমি
আরত কেহই জান্‌বে না।

ব্যর্থতার মান

তোমায় বলতে মনের কথা
রয়েছে মোর ব্যাকুলতা,
বল্‌তে না দাও, থাক্ সে গোপনে।
বঞ্চিত এই প্রাণের মাঝে
জাগে গভীর বেদনা যে
তাই জাগিয়ে রেখো মনের কোণে।

এ সুর আমার নয়ননীরে
বাজ্‌তে চায় ঐ চরণ ঘিরে
বাজ্‌তে না দাও, থাক্ সে চরণতলে।
রেখো তারে নীরব করে
সেইখানে ঐ ধূলার পরে
ডুবিয়ে তারে দাওগো নয়নজলে।

ব্যর্থতারই আগুন জ্বেলে
দেব আমার সকল ঢেলে,
ভস্মশেষে তাই জ্বালিয়ে রেখো।
আশা আমার দগ্ধ করে
শূন্য করে, রিক্ত করে
লজ্জাহরণ চরণছায়ে ঢেকো।

সার্থক দান

এ সংসারে সবার সাথে অনেক কথা কই,
একটি কথা আছে তোমার তরে।
নয়নপাতে নীরবে কত অশ্রুবোঝা বই
তোমার লাগি একটি ফোঁটা ঝরে।
কত না সুরে গাহি যে কত গান
কত বেদনা, কত যে অভিমান,
তাহার মাঝে একটি সুর ক্ষণে ক্ষণে বাজে
সে সুর শুধু তোমায় খুঁজে মরে।

আশার কত কুসুম মনে ফুটায়ে তুলি নিতি
একটি আছে তোমার পদতলে।
কত বাসনাপ্রদীপে মোর উজলি উঠে প্রীতি
একটি দীপে আরতিশিখা জ্বলে।
কত না রসে হৃদয় উঠে ভরি
প্রকাশে রূপে নব মূরতি ধরি,
একটি রূপ রাঙিয়া রহে সে যে তোমার রঙে
একটি মণি ললাটে শুধু ঝলে।

আঁধার পটে কত না তারা ফোটে নিবিড় রাতে
সেথায় একা তুমি জোছনাধারা,
আলো আঁধার মিলেছে যেথা উষার আঁখিপাতে
সেথায় তুমি জাগিছ শুকতারা।
কত ভাবনা নামে হৃদয়তীরে
একটি থাকে চরণ তব ঘিরে,
জাগরণে জাগিয়া ছোটে কর্ম্মধারা কত
একটি হয়ে তোমাতে হয় হারা।

বিশ্বপ্রেম

তোমারে যেই রেখেছে দূরে
তাহারি দ্বারে
কতনা রূপে এসেছ তুমি
ফিরেছ বারে বারে।
তুমি ত পূজা চাহনি নাথ
সবার পানে বাড়ালে হাত
তাহারি মাঝে নিতেছ দান
লুকায়ে আপনারে।

কেবলি যদি তোমারে প্রভু
করি নমস্কার
লহ না তাহা, লহ না, মুখ
ফিরাও বারে বার।
সবার সেবা রয়েছে যেথা
রেখেছ তুমি চরণ সেথা
তাহারি মাঝে করি প্রণাম
নিভৃত দেবতারে।

সুরের মিল

কে গো বাজায় নীরব পরশে,
সে যে হৃদয়বীণায় বাজে!
তারে তারে সুর ওঠে যে নেচে
ছোটে রক্তধারার মাঝে।
বিশ্বহৃদয়-স্পন্দনেরি তালে
অম্বরে যেই মৃদঙ্গ বাজালে
তারই তালে বাজাই যন্ত্র মোর
বারে বারে দেখি মিলছে না যে।

কোন রাগিণী কখন কে বাজায়
শুধু যন্ত্রে বাজে সে কি
কেমন করে কোন দিকে সে ধায়
কোথা রূপটি তাহার দেখি!
সেই সুরেরই ছায়াটি গোপনে
ছুটে এসে আঘাত করে মনে,
এখন আমি গাইতে চাই যে গান
ছায়ার মত আসে মিলে যায়।

কে বলে মন্ ভুলিয়ে রাখে গানে
সে যে গভীর বেদনা
সেই বেদনার কঠিন ঘায়ের তানে
কর যন্ত্র সাধনা।
অশ্রুজলের জোয়ার ব'য়ে যাবে,
তারই মাঝে সুরটি খুঁজে পাবে,
তখনই ঠিক ছন্দে সুরে তালে
নাচ্‌বে গানের লহর আমার প্রাণে।

অতিথি

মিশ্র বাহার

এসেছে অতিথি, দ্বারে এসেছে
ফুলে পল্লবে বর্ণে সুগন্ধে
সে যে ভুবনভুলানো হাসি হেসেছে।

সে যে মৃদু গুঞ্জনগীত গাহিয়া
এল নবীন তরণীখানি বাহিয়া
রহে তৃষিত নয়ন মম চাহিয়া,
আজি ভেসেছে, নিখিল ধরা ভেসেছে
একি আনন্দপ্লাবনে ভেসেছে।

আজি সরস দখিন-বায় পুলকে
প্রাণতরঙ্গ কম্পিত দ্যুলোকে
হের বাহিরিল চিত মম পলকে
ভালবেসেছে, তাহারে ভালবেসেছে
সেই ভুবনভুলানো হাসি হেসেছে।

অন্তরের উৎসব

পরজ

জাগিছ তুমি সুনীল নভে
জাগিছ এই প্রান্তরে
তেমনি পরিপূর্ণরূপে
জাগহে জাগ অন্তরে।
বাহিরে তব রসের লীলা
সে স্রোতধার পূতসলিলা
দিবসনিশি তাহারি মাঝে
চিত্ত যেন সন্তরে।

ধরণী শুচিবসন পরি
বাহিরিল এ উৎসবে
উতলা বায়ে বেজেছে বাঁশী
লুটিয়া ফুলসৌরভে।
তাহারি ছায়া হৃদয়বনে
বিছায়ে দাও অতি গোপনে,
কর মুখর বীণার তার
তব পরশ মন্তরে।

ভক্ত

কীর্ত্তন

কাঁদায়ে আর কেমনে তুমি
ফিরাবে তারে কোথা,
সকল সুখেদুঃখে সে যে
চরণে অবনতা !
টানিয়া কাছে আনিয়াছ যারে
এ ত্রিভুবন যে বাঁধা তার দ্বারে,
করেছে সে যে চরম আপনারে
নিখিল অনুগতা।

ভুলায়ে আর রাখিবে কত
অলঙ্কারে সাজে
আপনারে সে ভুলিবারে চাহে
সকল জনার মাঝে।
বিশ্বের মাঝে বিলাইয়া প্রাণ
খুঁজিয়ে মরে সে আপনার দান
তোমার মাঝে চরম অবসান
গভীর নীরবতা।

বিশ্বদেবতা

গৃহের প্রাচীর রচি' তুলে ব্যবধান
বিপুল অসীম সাথে ; আমার এ প্রাণ
আপনার মাঝে তৃপ্তি চায় লভিবারে
বিরলে বিজনে রহি'। সে বদ্ধ দুয়ারে
আসি ফিরে যায় কত তরঙ্গ আঘাত
কত দুঃখবেদনার কত অশ্রুপাত।
এ বিশ্বের দেবতারে নিজ সিংহাসনে
অচল অটল করি রাখিতে গোপনে
কত না প্রয়াস তার ! জাগে কত আশা
বাসনা অনলে জ্বলে দুরন্ত পিপাসা !
তবু গৃহদেবতার অক্ষুব্ধ বিহার
নিখিল বিশ্বের মাঝে ; পরিপূর্ণতার
তিল বাধা নাহি, জাগে মূরতি অম্লান
বাহির অন্তর ঘেরি রাত্রিদিনমান।

সম্মিলন

যুগে যুগে আসে আর যায়,
মিলন, মিলন সে যে চায়,
আসে যায় আলোকে আঁধারে
মোর সুখে দুখে বেদনায়।

এসেছে সে মধুঋতু সাথে
স্মিতহাসি লয়ে আঁখিপাতে ;
নিখিল চিত্ত ঘেরি তাই
উতলা পবন আজি মাতে।

এসেছে হিয়ার কিনারায়,
নূপুর বেজেছে পায় পায়,
মধুর হিন্দোল রাগিণীর
মূরতি চিত্তমাঝে ভায়।

এমনি সে নামে কত সাজে
ভূলোক দ্যুলোকে হিয়ামাঝে।
কত ছন্দে, কত নব রাগে
বাজে, সুমধুর বীণা বাজে।

সে যে আসে মোর কাছে ধেয়ে
শুধু মোর মুখপানে চেয়ে ;
শূন্যে কোথা সুদূরে কে জানে
যায় মিলনের গীত গেয়ে।

পবনে সুরভিটুকু তার
খুঁজে ফিরে অঙ্গ আমার ;
তাহার বীণার তারে তারে
বাজিতেছে আমার ঝঙ্কার।

ঝরে পাতা, ফোটে কিশলয়
ফুটে আর টুটে কুবলয়,
এরি মাঝে তারই আসাযাওয়া
নিত্য জাগরণ আর লয়।

আসে সে যে, যায় আর আসে,
চিরদিন মোরে ভালবাসে,
সবে বাঁধি মহা সম্মিলনে
আসে মোর মিলনের আশে।

দুয়ারে

সিন্ধু।

বধূ এসেছে প্রিয়তম
খোলগো খোল দ্বার !
লজ্জা অবগুণ্ঠন
ঘুচাও এইবার।

মেলিও আজি নয়ন
রচিও নব শয়ন
কুসুম করি চয়ন
গাঁথিও ফুলহার।

নিভৃত বনমাঝে
তাহার বীণা বাজে
মৃদু পবনে রাজে
সুরভি উপহার।

তুমিও সখি দিও
সুধা বচন অমিয়
চিরজীবনপ্রিয়
লভিও আপনার।

বঁধু

সে যে আসে তার আশে
ভালবাসে প্রাণ যারে।
তারি লাগি আছে জাগি
অনুরাগী বঁধুয়ারে।

তারি তরে নিশিভোরে
প্রেমডোরে গাঁথে মালা
গাহে নিতি মধুগীতি
আনে প্রীতি ভারে ভারে।

বঁধু মাতে মধু রাতে
তারি সাথে কি মিলনে ;
সে বিতানে বাঁশী তানে
কহে প্রাণে কি গোপনে।

হৃদিতলে কালো জলে
কত ছলে নামে ধীরে,
উতলা সে কি উচ্ছাসে
কলহাসে ঘিরে তারে।

নিবেদন

কীর্ত্তন

ওগো ডাকার মত হয় না যে ডাকা
কথার বোঝা শুধুই ওঠে বেড়ে
হয়না যে মন চরণতলে রাখা
আমার সকল মলিন ধুলা ঝেড়ে।

তোমার রসে হয়না মাতোয়ারা
ব্যাকুল করে বয়না চোখে ধারা,
তোমার ডাকে দেয় না সে যে সাড়া
উঠছে না সে অলস শয়ন ছেড়ে।

ওগো পরাণবঁধু আছ পরাণ মাঝে
একান্তে সেই হেরব তোমায় কবে,
বুকভরা সেই বোধটী জাগে না যে
কেমন করে শূন্য পূর্ণ হবে!

আনন্দহীন হৃদয়নিকেতনে
বাজে না যে বাঁশী প্রেম বিহনে,
জাগে না সেই দৃষ্টি দু'নয়নে
অবাধে যায় অরূপ মূর্ত্তি হেরে।

সুদূর

সুদূরের পানে নয়ন মেলিয়া চাই
স্বপনের মত কি রূপ নয়নে ভাসে!
কোন্ গীতরসে টুটিয়া বক্ষ তাই
কি যে বেদনার শতদল পরকাশে।
সকল ডুবায়ে জনম জনম গো
ভরিয়া আমার গোপন মরম গো,
সুদূরের ধন অন্তরতম গো
নিত্য নিত্য চিত্তে যেন বিলাসে।

সুদূরে কোথায় বেজেছে করুণ বাঁশী
হৃদয়যমুনা উজান বহিল তায়,
কূলে কূলে তার ভরি উঠে কলহাসি
মত্ত লহরী উদ্বেল জোছনায়!
আমার পরম চিত্তহরণ গো!
আমার মোহন স্নিগ্ধবরণ গো!
আমার জনম, আমার মরণ গো!
নিত্য জাগিছে সুদূরে চিত্ত আকাশে।

সকল-ভোলার দেশ

অতল সাগর মাঝে আছে
সকল-ভোলার দেশ,
আদি অন্ত নাহিক,
সেথায় নাই বিধানের লেশ!
নানান্ দ্বারে দিচ্ছে হানা
অনেক শোনা, অনেক জানা
কত বারণ কতই মানা
নাহিক তাহার শেষ,
তার মাঝেতেই আছে গো সেই
সকল-ভোলার দেশ।

নাইক সেথায় রাত্রি দিবা
নাইক আঁধার আলো
রূপ অরূপের ভেদ কিছু নাই
নাইক সাদা কালো।
নানান্ দ্বারে আছে তাহার
রঙ্‌-বেরঙের কতই বাহার
কত চাওয়ার, কত পাওয়ার
কত মন্দ ভালো;
সে দেশটিতে কোথাও কিন্তু
নাইক আঁধার আলো।

হাসিকান্না সুখ ও দুঃখ
সেথায় একাকার,
আকার সেথা যায়না দেখা
নাইক নিরাকার!
নানান্ দ্বারে আছে কত
বড় ছোট'র আকার শত
কেউবা উঁচু, কেউবা নত
কেউবা নির্ব্বিকার;
সেথায় কিন্তু নাই ভেদাভেদ
সকল একাকার।

সকল যাত্রী চলেছে সেই
সকল-ভোলার দেশে,
কেউ গিয়েছে, কেউ থেমেছে
দ্বারের কাছে এসে।
সন্ধান যে পেয়েছে তার
ভাব বা অভাব নাই কিছু আর,
আনন্দে তার নিত্য বিহার!
নয়ন অনিমেষে
হেরে সকল-দেখার অতীত
সকল-ভোলার দেশে!

মজার কথা

এ'ত বড় মজা ভাই
যারে পেয়েছি তারে চাই,
দেখিনা যাহা, বলি তা' আছে
আছে যা, 'নাই, নাই'।
নিকটে যাহা রয়েছে জুড়ে,
তাহারি লাগি ভ্রমি সুদূরে,
যে গান কভু বাজেনা সুরে
সে গানই শুধু গাই,
এ'ত বড় মজা ভাই।

এ'ত বড়ই মজা ভাই
আছে যা, তারে পাই ;
জানি যা আছে অতি গোপনে
দেখি তা সব ঠাঁই।
আমার বলে জেনেছি যাহা
শেষে যে দেখি সবার তাহা,
সবার যা তা আপনি পাওয়া,
দিই যা লভি তাই,
এ'ত বড়ই মজা ভাই।

এ'ত বড়ই মজা ভাই,
নিজেরে নিজে চাই,
সবারে টানি নিজের পানে
সবার পানে ধাই,
আপন কথা পরের কানে
শোনাতে মন ফোটে যে গানে
অজানা যেই তাহারে জানি,
জানি যা', জানি নাই ;
এ'ত বড়ই মজা ভাই।

গুহাহিতম্

রূপ অরূপের মাঝখানেতে
কে বেঁধেছে বাসা,
সেই গভীরের অতল মাঝে
কাহার যাওয়া আসা !

সেথা নাইক ঢেউয়ের মেলা,
নাইকো আলোছায়ার খেলা ;
তবু নাইক সেথা আঁধার ঘেরা
শূন্যতলে ভাসা !

ও সেই রূপ অরূপের মাঝখানেতে
কে বেঁধেছে বাসা।
প্রবল বায়ের ঝঞ্ঝা যত
সেথায় এসে থামে,
দুইটি তীরের মনের কথা
সেই দিকেতেই নামে।

সেথায় সকল গীতি এসে
একটি পরম সুরে মেশে,
সেথা নিরাশ হৃদয় অশ্রু মোছে
থাকে না তার আশা !
ও সেই রূপ অরূপের মাঝখানেতে
কে বেঁধেছে বাসা !

বর্ষশেষ

বেহাগ—দাদরা

বরষে বরষে জীবন পরশে
হরষে বেদনায়।
নিখিল ভুবন নন্দিত তারি
সঙ্গীতসুষমায়।
সুখে দুখে সে যে চির প্রণম্য,
অসীম সে, তবু নহে অগম্য,
সে প্রেমমূরতি হের সুরম্য
সুন্দর জোছনায়।

বিশ্বভুবনে শুন মন্ত্রিত
তাঁর বন্দনা গান,
সারা বরষের সকল ক্লান্তি
কোথা লভে অবসান।
ঘেরিয়া অপার মহা জলধিরে
শত তরঙ্গ যায় আসে ফিরে,
স্থির ধ্রুবতারা জাগে সে তিমিরে
গম্ভীর মহিমায়।

বিরহী

কত জন্মজন্মান্তর আছি ওই চরণের তলে ;
কত ব্যর্থ যামিনী যে গিয়েছে দরশকুতূহলে,
কত আশা জাগরণে, উদয়ের প্রথম সোপানে
শুনিতে সে পদধ্বনি ! চাহিবারে ঐ মুখ পানে
কতবার মেলেছিল সজল কাতর দু'নয়ান,
শূন্য মনে ফিরেছিল, পায় নাই তোমার সন্ধান।
হে চিরবাঞ্ছিত মোর, খেলা নাহি হল সমাপন
আজিও আমার ; নাথ ! বিরহের নিশীথ যাপন
সঙ্গীহারা একাকিনী ! শূন্যমাঝে হৃদয় আমার
আর্ত্তকণ্ঠে যাচে শুধু একবিন্দু বারি করুণার
চাতকের মত ! শুধু চিরদিন জীবনের ফুল
ভাসিছে স্রোতের টানে, লভে নাই চরণের মূল।
কত না আবর্ত্তমাঝে ঘুরে মরে, নাহি তার শেষ
অকূলের কূল কোথা ভেবে মরে, না পায় উদ্দেশ।

দরিদ্রের ধন

এ পাপের বোঝা, শত জনমের কলুষের কালী
নামিবে, ঘুচিবে কবে নাহি জানি! কবে দিবে জ্বালি
এ বিশ্বমন্দিরে মোর অতি মৃদু দীপশিখাখানি!
লজ্জা যদি দেয় মোরে, তবু তারে অতি ক্ষুদ্র মানি
এক প্রান্তে রেখো ফেলে! দেখা যদি নাহি পাই তবু
এই আলো বক্ষে ল'য়ে রব জাগি জন্মজন্ম প্রভু!
ঈষৎকম্পিত এক অতি ক্ষীণ আলোকের রেখা
তা'লয়ে ভ্রমিব পথে; একটু আভাসে শুধু দেখা
যদি পাই, তাই ভাল! দীপ্তি আমি নাহি চাহি নাথ,
পরিপূর্ণ প্রাণ লয়ে করিতে চাহিগো প্রণিপাত
একান্ত ভকতিভরে। বিশ্ব যদি হয়গো বিমুখ,
বিশ্বদেবতার পানে নিত্য চাহি রহিবে উৎসুক
উন্মুখ এ দীপশিখা। কর জাগ্রত এ চেতনা
'হোলো না হোলো না কিছু' এ জানার গভীর বেদনা!

বরষা আবাহন

বনে বনান্তে দিকে দিগন্তে
এসহে নিবিড় এসহে!
হৃদয়-ভরানো জীবন-জুড়ানো
এস সুগভীর এসহে!
এস পবিত্র, এস নিরমল,
এস তাপহর, এস সুশীতল,
অশনিমন্দ্রে এস মহাবল,
ঘোর গম্ভীর এসহে!

তৃষিত শুষ্ক তপ্ত ধূলায়
পরাণ বরষি এসহে!
বিদ্যুত-জ্বালা চকিতে জ্বালায়ে
ভীষণ হরষে এসহে!
এস ঝরঝর সজল ছন্দে,
এস ধরণীর আর্দ্র গন্ধে,
এস নবঘন—ঘন আনন্দে,
পুলক-অধীর এসহে!

করুণকঠোর

প্রলয় মূর্ত্তি ধরিয়া এসেছ দুয়ারে ;
রুদ্র, ভীষণ, নমি বার বার তোমারে।
ধূর্জ্জটি, তব জটাজাল উড়ে গগনে,
মাতে উন্মাদ নৃত্য ঝঞ্ঝাপবনে,
ললাটনেত্র চমকে আঁধার ভেদিয়া ;
হে ঈশান, তব প্রলয়-বিষাণ ফুকারে !
রুদ্র, ভীষণ, নমি বার বার তোমারে।

হে নিঠুর, এলে করুণ মূরতি ধরিয়া,
সব তাপদাহ নিমেষে লইলে হরিয়া !
ঝরিছে তোমার বেদনা বরষাপ্লাবনে,
রুদ্ধ দুয়ারে করিছ আঘাত সঘনে ;
মধুরে ভীষণে মিলন নেহারি অপরূপ ;
প্রলয়, সৃজন, নাচিছে বিশ্বপাথারে ;
রুদ্র, দয়াল, নমি বার বার তোমারে।

অম্বর ঘেরি ডম্বরু তব বাজে হে,
এসহে ভিখারী, এস মঙ্গল সাজে হে !
এমনি ধূলায় ধূসর করিয়া লহ গো,
আদেশ তোমার বজ্রের রবে কহ গো !
দগ্ধ করিয়া সকল অশিব সংশয়
রিক্ত করিয়া করহে পূর্ণ আমারে !
হে শিব, কঠোর, নমি বার বার
তোমারে !

ব্যর্থতা

শুধু এই সব, এই সব ?
আপনার কানে শুনিব কি বসে
আপনারি কলরব ?
শুধু ভুলে থাকি আপনার সুখে
আপন বেদনা সহি সদা বুকে
শূন্য বাক্য কহি নিজ মুখে
পূর্ণতা অনুভব !
এই সব, এই সব ?

শুধু এই খেলা খেলে সবে
আপনার পিছে ছুটি কি গো কভু
আপনারে ফিরে পাবে ?
সকলের মাঝে প্রবেশের দ্বার
বন্ধ করিয়া ভাবে বার বার
এই ত পূর্ণ হয়েছে আগার
সবই আছে, কিবা চাবে।
এই খেলা খেলে সবে ?

শুধু কেবলি এ জটিলতা
পথে পথে মোর বাঁধা আছে পায়
বলে মোরে যাবে কোথা !
যে মালা কণ্ঠে পরাইতে চায়
চোরা কাঁটা তার শুধু বিঁধে গায়,
কারে চাহি মন দু'হাত বাড়ায়
কি লাগি চঞ্চলতা !
কেবলি এ জটিলতা।

শুধু এই সব, এই সব ?
সকল ডুবায়ে শুনিব বিশ্বে
আপন কণ্ঠরব ?
আপনার সুখ, আপনার দুখ
সবা হ'তে মোরে করিবে বিমুখ ?
হবে না চিত্তে কভু জাগরূক
বিপুল সে অনুভব ?
এই সব, এই সব ?

অচেনা

গানে দেব কোন সুর লয়
বাঁধব কেমন ছন্দে
ভরে দেব কোন দেবালয়
কোন কুসুমের গন্ধে !

একলা বসে সুখে দুখে
রইব চেয়ে কাহার মুখে ;
মাতিয়ে নেব শয়ন আমার
কোন পুলক আনন্দে !

কোন বেদনায় বাজবে আমার
হৃদয়-বীণার তন্ত্রী,
কোন পরশে বাজ্‌বে সে তার
কে হবে তার যন্ত্রী।

সাগর আমার কূলে কূলে
কোন জোয়ারে উঠ্‌বে দুলে ;
মর্‌বে আমার নিশীথ রাত্রি
কোন সুধাময় চন্দ্রে।

"বীণ"এর পরবর্ত্তীকালে রচিত কবিতা

শিল্পীর প্রতি

সুদূর বাঞ্ছিত ধন অন্তরে আপনি দেয় ধরা,
হৃদয়ের রক্তে তাই রাঙাইয়া রূপের পসরা
কা'রে দাও পূজাঞ্জলী ? না জানি সে চেনা কি অচেনা—
তারি সাথে ভুবনের হাটে তব চলে বেচা-কেনা।
রূপের মাঝারে তুমি আনি দাও অরূপের মায়া,
ভাবের আনন্দ দিয়ে বিরচিলে অপরূপ কায়া।
বর্ণে বর্ণে ছন্দে ছন্দে যে সঙ্গীত রূপে ওঠে ভরি'
শ্রাবণ-প্লাবন সম সে রাগিণী বিশ্বে পড়ে ঝরি'।
বিচিত্র ঋতুর রসে সিঞ্চিত সে অমৃত সরস—
তোমার এ চিত্রপটে কাঁপি উঠে তাহারি হরষ।
আঁখি দিয়ে কী হেরিবে ?—মেলেছ ধ্যানের ত্রিনয়ন,
মুর্ত্ত মাঝে অমূর্ত্তের তাইত লভিলে দরশন !
ব্যক্ত যা' তা' কণাটুকু, বিরাট সে রয়েছে গোপনে,
জাগার নয়ন মেলি শিল্পী তাই রচিলে স্বপন।

১

চাতক সম হৃদয় মম পিয়াসী !
আজি কাজল মেঘের পানে
সজল দিঠি কাতরে হানে,
তাই এ সুধানিঝর ধারে
দাঁড়ালে দ্বারে কি আসি'।
কেতকী-বন-কেশর বাসে
বায়ু বিভল
ঝরা যূথিকা আসন-রচা
কাননতল।
মনের তারে গুমরে সুর,
ছন্দতালে বাঁধা সুদূর,
আজি এ বীণা তারে যে বাজে
নবীন সাজে বিলাসি'॥

২

কলিকা কহে "মালিকা রচি'
তুলিব কার বুকে ?"
তরু সে কহে "ঘরের খেলা
গেল কি তবে চুকে' ?
মরুর বুক দীর্ণ করি'
আলোক পানে জীবন ধরি'
স্বপন মাঝে গোপন করি'
নব আগন্তুকে,
কাটানু কত দিবসরাতি
কি আশা উন্মুখে—
গেল কি সবই চুকে' ?
আজিকে তব সুরভি বহে পবনে
অলি সে ফিরে গুঞ্জরিয়া শ্রবণে।
পুলক তারি ভুলালো সব ?
যাচিছ প্রেম কী অভিনব।
পরাণব্যথা আজিকে ক'ব
তোমারে কোন্ মুখে।
গেছে কি সবই চুকে ?"
মালিকা কহে "নবীন মালা
তোমারি রস-বরণ ঢালা
জুড়াবে তব বুকের জ্বালা
নব আশার সুখে ;
যাবে না কিছু চুকে' ॥"

৩

সখি, বাদল রাতের গোপন বেদনা
তব আঁখিতে জাগিল আভাসে।
শুনিতে আমার বিরহের গান
দাঁড়াইলে দ্বারে কী আশে।
আজি এ আঁধারে আঁখি-বিনিময়
হোলো তোমা সাথে, তারি বিস্ময়
শিহরি' উঠিছে হৃদয়ে আমার
মগন ছিল যে নিরাশে।
বিরহের স্রোতে ভাসি কোথা হতে
আসিলে হৃদয়তীরে,
আমার গানের মূর্চ্ছনা কাঁদে
তোমার চরণ ঘিরে।
যূথিবন হতে সৌরভ হরি'
অঞ্চল তব দিনু আজ ভরি'
শত বরষার পূজা-উপচার
ছিল নিবেদন-তিয়াষে ॥

৪

"সোণার রথে অমরা হতে
কে এল গো, কে এল।"
বনের বীণায় শ্যামল সুরে মৌনবাণী শিহরিল!
রাঙা হাসির অন্তরালে শিমুল কাঁদে
"দেখিনি হায়,"
পলাশ বলে "দিল না ধরা, মরি যে লাজে
বিফলতায়।"
কোকিল বলে "কুহরি' সারা,
পথের না পাই কুলকিনারা
ভাগ্যে কি মোর এই ছিল!"
মন-বিহগ ঝাপটি' পাখা
কহে 'এল গো ঐ এল,'
নয়ন তবু সুরের ঘোরে আভাস তার নাই পেল!
মর্ম্মমাঝে রঙের মেলা
গোপনে খেলে সুরের খেলা,
পুলক তারি বুকের মাঝে
ছন্দে তালে হরষিল
হৃদয়বনে গন্ধ তারি দখিন বায়ে বিহরিল,
ঐ এল গো, ঐ এল॥"

৫

দুটি কথা ব'লে যাও গোপনে
আমার নিশীথ স্বপনে।
কেহ নাহি কাছে
শুধু পিয়াসী হৃদয় তব মিলন যাচে,
আজি বিরহ-উদাস পবনে।
গান গাহি মনে মনে
অকারণে,
তোমা লাগি জাগি মম বিজন ভবনে।
তুমি শুধু ধীরে
চিরপরিচিত সম এসো মনোমন্দিরে,
আজি নব উৎসব লগনে।

৬

দেওয়ার খেলা সাঙ্গ হোলো নাকি?
নেব কি তবে এবার মুঠি ভরি'?
গোপন কোণে যা কিছু আছে বাকি
দানের ছলে নিওগো তাই হরি'।
আলোর দান ভরিয়া বুকে
কুসুম চাহে কী হাসি মুখে!
ঋণের ভার চুকায় তার
সৌরভ বিতরি',
দানের ছলে লও যে তাহা হরি'।
দেবার মোর না যদি থাকে
ভরিয়া দাও শূন্যতাকে,
তাহাই শেষে লইও হেসে,
লজ্জা দূর করি'—
দেওয়া-নেওয়ার খেলিব খেলা
দিবস-বিভাবরী॥

৭

দেখা সে কি নয়নের দেখা ?
চিত্তপটে ধীরে ধীরে ফোটে যেই রেখা
বাহিরে তাহারে টানি
শিল্পী সে আঁকে ছবিখানি।
বর্ণছন্দ অন্তরালে আছে যেই রহস্যের দ্বার
তাই যে হ'য়েছে পার
তার দেখা শুধু নয়নের দেখা নয়।
ভাবের ফল্‌গু বয়—
সে অতলে ডোবে যার মন,
সে যে অনুক্ষণ
আঁধারের বুকে হেরে অনির্ব্বাণ আলো,
মরণের কালো
বহি আনে পরপার হ'তে নবজীবনের
জ্যোতির্ম্ময় বাণী !
যত জানাজানি
তারে টেনে আনি
অজানার পারাবারে, নিমেষে সে সকলি হারায় ;
তাই ফিরে পায়
সব হারানোর মাঝে পাওয়া চিরন্তন।
রূপের বন্ধন
ছিন্ন করি অরূপের দেখে সে আভাস।
নানা বরণবিলাস
অন্তরের সুধারসে মিলি' সুষমায় ওঠে ভরি
ধ্যানের নয়নে পড়ে ঝরি
সীমাহীন ব্যঞ্জনার রেখা—
তারে বলে দেখা।

আবাহন

সুদূর প্রতীচ্যে উচ্চে তুলিয়া শির
প্রচারিল নারী নব মুক্তির বাণী।
মোরা হেথা ছিনু পড়ি বন্ধনজর্জ্জর
নেমে এলো দেবতার বরাভয় পাণি।
আজি শুভ জাগরণ ক্ষণে
স্বাগত অতিথি বঙ্গের প্রাঙ্গণে।
হেথা জাতি বর্ণভেদ নাহি,
মিলনের মন্ত্র মোরা গাহি।
সবার সেবার লাগি মোরা উন্মুখ,
সবারে আপন করি দীনতা ঘুচুক।
নন্দিত হোক সব কর্ম্ম,
প্রীতি ভরি দিক সব মর্ম্ম,
কুটীর হইতে মহা হর্ম্ম্য
মুখরিত হোক্ নব জীবনের গানে।
হে অতিথি, আমরা যতনে
বরিব তোমারে প্রীতিসম্ভাষণে
জ্বালি মঙ্গল দীপ তম অবসানে।
হে নারী শুনাও তব মুক্তির বাণী
তোমরা এনেছ টানি বিশ্বের দেবতার শুভাশীষ বরাভয় পাণি।

---

* নারী শিক্ষা সমিতির বিদ্যাসাগর বাণীভবনে, লেডি উইলিংডন মহোদয়ার আগমন উপলক্ষে।

শিল্পী নন্দলাল বসুকে লিখিত পত্র

২৮শে মাঘ
১৯২১ সাল

১

ভো ভো শিল্পীত্রয়
লেখনীর তীর জুড়ি কর-ধনুখান
ছাড়িল তিনেরে লখি' শব্দভেদী বাণ।
সে বাণ বিঁধিল কারে পথ মাঝখানে ?
কে সেজন নিল হরি', খোদা-তাল্লা জানে !
তিন তিন মহাবীর একা হেথা দীন,
তুলি-রঙে মারে টান, ছোটে "গয়া" "চীন"
শব্দেরে আটকি' জব্দ কর রেখাটানে
এ ভোঁতা কলম তাই লাজে হার মানে।
কলাভবনের কালাবঁধু নন্দলাল
ভীলেদের মথুরায় ?—হায়রে কপাল !
ইন্দ্রপুরী আধা রচি' শচীশূন্য সুর
থ্রি-কাসেল্‌ধোঁয়া-স্বর্গে ভাবরসে চুর !
হলধর অসিত সে বলরাম সম
—বয়সে কালার ছোট, উচ্চে দাদাতম—
উড়ায় বিরহ-তাপ হাসির দাপটে,
সে রসে বঞ্চিত—তবু চাতাল তো বটে !
অসহযোগিতা চিঁড়ে ভেজে না কথায়,
অসহ বিরহ-জ্বালা সহিয়া হোথায়
যোগীত্রয় গুহামাঝে করিতেছে বাস—
এরাই গাঁধীর চেলা, সাবাস, সাবাস্।
বুরোক্রাসি বুড় খাসি কারতে জবাই
ছেলে-বুড়া, বাবা-খুড়া লেগেছে সবাই !
কলিকাতা এলো রাজা জারজের খুড়ো,
খেয়ে গেল ঝাঁটা, তাও একেবারে মুড়ো !
কেন মিছে আছ পড়ি গুহার গরতে ?
মরতের জীব ফিরে এসগো মরতে।

২

শিলং
৩১-৫-২৭

আদিপর্ব্ব

মোর মানসের পটে ছবি আঁকি বটে,
সে যে স্বপনের সাথী ;
তব তুলির লিখন সে চিরন্তন
আমি খেলা-ঘর পাতি।
মোর গোপন বিহার সন্ধান তার
আমি ছাড়া কেবা জানে !
তুমি আলোকের কূলে তারে ধর তুলে
নিখিল বিশ্ব পানে।

অন্তপর্ব্ব

মেঘলোকে পাঠাইনু মানসের দূত।
শ্যামল পরশে রসি' সজল মরুৎ
প্রবাসবেদনা বহি' যাবে খারসান
সমব্যথী তোমা কাছে। প্রাণ আন্‌চান,
তহবিল শূন্য, মন উদাস বিভল,
কোথা সেই ধুধু প্রান্তর সমতল !
ভূতভাবনের যত কিম্ভুতের দল
পাইনের ফাঁকে ফাঁকে হাসে খল্‌খল্‌।
শিরোপরি প্রাবৃটের ঘন কোলাহল
পদতলে খাড়া পথ বিষম পিছল।
মন বলে—আর কেন, চল্‌ ঘরে চল্‌
শীতল হয়েছে ধরা, নেমেছে বাদল।

রমা-স্মরণে

নানা বর্ণে স্মৃতিরেখা বহু বর্ষ ধরি',
কর্ম্ম-উৎসবেভরা দিবাবিভাবরী
মর্ম্মে মোর আঁকিয়াছে বিচিত্র লিখন।
এসেছিলে শিশু, লয়ে নবীন জীবন,
উৎসধারে গীতরস নিত্য করি' পান
পেয়েছিলে যে আনন্দ, করেছ তা' দান।
অন্তরে প্রেমের সুধা, কণ্ঠে গীতরস,
বহিয়া করুণালক্ষ্মী বরষ বরষ
প্রান্তরের নীলাকাশ করেছ মধুর,
সেথা রবে তব স্মৃতি চির-ভরপুর।
কর্ম্ম অন্তে চিত্ত মোর লভিত আশ্রয়
নির্জন কুটীরে তব ; প্রীতিবিনিময়
শূন্য হৃদয় মম করিত ভরণ,
ব্যথিত হৃদয়ে বহি তাহারি স্মরণ।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত

কোনো গীতিকবি বা শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির সম্বন্ধে বিচার কর্‌বার সময়, তাঁর সমগ্র আত্মপ্রকাশের অন্তর্গত ক্রমবিকাশের রূপ সমঝ্‌দার বিচারকের চোখে ধরা দেয়। বাহিরের রূপ, রস, গন্ধস্পর্শের তরঙ্গাঘাত শিল্পীর মর্ম্ম-বীণার তারে যে স্পন্দন জাগিয়ে তোলে, তাই তাঁর অনুভূতির আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত হয়ে নানা রসসৃষ্টির উৎসধারায় উৎসারিত হয়। অন্তরের ভাবলোকের এবং বাহিরের সৌন্দর্য্য-লোকের মিলনে যে পুণ্য সঙ্গমতীর্থ রচিত হয়, তারি কেন্দ্রস্থলে সকল প্রয়োজনাতীত অনির্ব্বচনীয় রূপ-সৃষ্টিগুলি আপনার পূর্ণ মাধুর্য্যে বিকশিত হয়ে বলে "অয়ম্ অহম্ ভো" !—এই আমি আছি। যখন এই প্রাণবান্ সত্ত্বা বর্ত্তিয়া থাকার আনন্দের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করে, তখন শাশ্বত আনন্দলোকে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। বাহিরের প্রভাব তখন তার অন্তরকে স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষুব্ধ করে না।

শিল্পসৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীতে যে তর্কজাল বোনা হয়েছে, তাতে আবদ্ধ হয়ে বন্ধনদশাকাতর অনেক লোক অনেক আর্ত্তনাদ করেছে; অনুভব করার জিনিষকে বোধগম্য কর্‌বার চেষ্টা করেছে; indefinable-কে define কর্‌বার চেষ্টা করেছে। বুদ্ধির দ্বারা তার ব্যবচ্ছেদ করেছে; অনুভূতির দ্বারা সেই রসসৃষ্টির সুষমার অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব তারা উপলব্ধি করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের অভিব্যক্তির ধারা আলোচনা করে দেখ্‌বার সুযোগ আমার হয়েছে। প্রথম থেকে এ পর্য্যন্ত তাঁর নব নব সুরসৃষ্টির ক্রমবিকাশের ইতিহাস লিখ্‌তে গেলে যে দূরদৃষ্টি ও শক্তির প্রয়োজন, তা' আমার নেই; তবে আমার ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা যতটুকু বুঝেছি, তা' সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর্‌ছি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে।

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সাহিত্যের আবহাওয়ার মধ্যে বাস কর্‌তেন এবং সাহিত্য আলোচনা ও রচনায় উৎসাহিত হ'তেন, এ কথা তাঁর জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন। বঙ্কিমযুগের নব জাগরণের প্রথম প্রভাতের অরুণালোকস্পর্শে তাঁর প্রতিভার উদ্বোধন হয়েছিল, এবং পিতা, ভাই, ভগ্নী, সকলের স্নেহচ্ছায়ে ও উৎসাহের অনুকূল বায়ুতে তাঁর নব উন্মেষিত প্রতিভা উদ্দীপ্ত হয়েছিল।

সঙ্গীতে তাঁর অনুরাগ, রসানুভূতি ও আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলা চলে। আমাদের পরিবারে গানবাজনার চর্চ্চা বড়ো কম ছিল না। বড়ো বড়ো ওস্তাদ এসে সেরা সেরা হিন্দী গান (বেশির ভাগ ধ্রুপদ) গাইতেন। আর সেই সুরগুলিতে বাংলা কথা বসিয়ে ব্রাহ্ম-সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য গান রচনা কর্‌তেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়নমগ্ন; পিয়ানোতে বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর গৎ বাজাচ্ছেন আর তাতে কথা বসিয়ে গান তৈরী কর্‌ছেন কবি নিজে। এই হলো গীতরচনার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। বাহিরের প্রভাব এবং traditionএর ধারা যুগপৎ তাঁকে রসের খোরাক জোটাতে লাগ্‌ল। মাঝে মাঝে স্বকীয় প্রতিভার রশ্মি tradition এবং ওস্তাদীর গবাক্ষদ্বারের ভিতর দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরেছিল, কিন্তু আবরণ বিদীর্ণ করে নিজস্ব প্রতিভার

দীপ্তি তখনও উদ্ভাসিত হয়নি। ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন পাপক্ষয় কর্‌বার একান্ত আগ্রহ দেখে রবীন্দ্রনাথও ভাবাবেগে গান লিখলেন—"আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে পদে পদে পথ ভুলি হে।" ছ'জনার তাড়নায় কাতর ভাবপ্রবণ অশ্রুবিলাসী শ্রোতাদের তিনি মুগ্ধ করেছিলেন, কিন্তু বীণাপাণির আসন তখনও শূন্য ছিল। এ কথা লিখ্‌লুম বলে পাঠক ভাববেন না যে, তিনি সে সময়ে উচ্চদরের সঙ্গীত রচনা করেননি। পরবর্ত্তীকালে যদুভট্ট এবং রাধিকা গোস্বামীর কাছ থেকে সুর আদায় ক'রে তা'তে কথা বসিয়ে যে সব ব্রহ্মসঙ্গীত তিনি রচনা করেছিলেন, তা' অপূর্ব্ব বাক্য-যোজনায় এবং বীর্য্যদ্যোতনায় অননুকরণীয় সম্পদে মহীয়ান।

এরপরে দেখা যায় classical সুরগুলির বিশিষ্ট রস আত্মসাৎ ক'রে তিনি গীতিনাট্য রচনায় সিদ্ধহস্ত হয়েছেন। "বাল্মীকি প্রতিভা" ও "মায়ার খেলা"র গানে classical প্রভাব সুস্পষ্ট। এই গীতিনাট্য দু'টীর গানগুলি কথা ও সুরের হরগৌরী মিলনের অপূর্ব্ব উদাহরণ। এই সময় আরও কতগুলি গান রচিত হয়, যার lyrical beautyর তুলনা নেই। বাল্যকালে আমি সে গানগুলি শুনে মুগ্ধ হতুম, তৃপ্ত হতুম, আর আপন মনে গেয়ে যে কী আনন্দলাভ কর্‌তুম, তা' কথায় বোঝাবার শক্তি আমার নেই। পৃথিবীর সমস্ত একান্ত intimate সম্বন্ধ অতিক্রম ক'রে কোন্ স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ হতুম কে জানে! গানগুলি হচ্ছে "আকুল কেশে আসে", "আহা জাগি' পোহাল বিভাবরী", "আজি শরত তপনে", "তোমার গোপন কথাটি" ইত্যাদি। কথার অর্থ আমার কাছে এত অকিঞ্চিৎকর ছিল যে, সে সময়কার কোন রবীন্দ্রবিদ্বেষী যখন আমাকে বল্‌লেন যে, রবীন্দ্রনাথ "আহা জাগি' পোহাল বিভাবরী", এ গানটি কোন প্রেমিকাকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, তখন যে কী আহত হয়েছিলাম বল্‌তে পারিনে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের এরূপ বস্তুতান্ত্রিক অর্থ অনেকেই কর্‌ত।

রবীন্দ্রনাথ এ পর্য্যায়ের গানগুলিকে emotional আখ্যা দিয়াছেন। Emotional তো বটেই! Lyric মাত্রই emotional, কিন্তু সে emotion intimate নয়। এ যেন ক্ষণস্থায়ী সুখদুঃখের দ্বন্দ্বের অতীত—কোন্ এক অক্ষুব্ধ সরসীনীরে বিকশিত শতদল—"তার বাঁধন যে নাই"। এই detachment হোলো artএর মূল কথা।

কবির সমস্ত কাব্যজীবনের ধারার মধ্যে দেখতে পাই তিনি অধ্যাত্মজগতের এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁচেছেন, যেখানে তাঁর দৃষ্টি বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যতকে অতিক্রম ক'রে শাশ্বত আলোকের আনন্দে উদ্ভাসিত। এ দৃষ্টির সাহায্যে আবিষ্কৃত সত্যবাণীর অব্যাহত স্রোত বৈদিকযুগ থেকে এ কাল পর্য্যন্ত বয়ে আস্‌ছে, এবং নানা যুগের নানা সমস্যার ঘাতপ্রতিঘাতে নানা সমাধানে উপনীত হয়েছে। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ human interest। আমার তো মনে হয় যে তিনি intensely human। আর একদিকে দেখ্‌তে পাই তাঁর প্রকৃতিপ্রীতি। যা-কিছু প্রাণবান্, যা কিছু আপনার আনন্দবেগের প্রেরণায় আপনাকে নিঃশেষে দান করেছে এবং নব নব জীবনের পূর্ণতায় বিকশিত হচ্ছে, তাকেই তিনি একান্ত আপনার করে নিয়েছেন। তাঁর রচিত "ছিন্নপত্র" বইটি যিনি পড়েছেন, তিনি

বুঝ্‌তে পার্‌বেন আমি কেন এ কথা বল্‌ছি। অধ্যাত্মজীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাঁছে মানুষ এবং প্রকৃতির ব্যবধানের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, দুই-ই তাঁর পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছে।

সত্যের চরম উপলব্ধির শাশ্বত আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যখন বাণীর বরপুত্রের আসনে আসীন, তখন তাঁর সুরশিল্পসাধনার পূর্ণ পরিণতি দেখ্‌তে পাই। যে কথা নানারূপে নানা ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে, তা সুরের ব্যঞ্জনায় অরূপ মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে আনন্দলোকের রহস্যের দ্বার অবারিত করে দিয়েছে। ধ্যান-সমাহিত চিত্ত সুরের উৎসধারার সন্ধান পেয়েছে ব'লে অন্তরের সুরের নির্ঝরিণী কলস্বরে ধাবমান—"কার সাধ্য রোধে তার গতি।"

কবির আধ্যাত্মিক সাধনালব্ধ অপূর্ব্ব বাণীর সঙ্গে ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের বাণীর ভাবের মিল আছে, এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু বাণী এবং সুরের অপূর্ব্ব মিলনে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে আদর্শ-স্থানীয় হয়েছে কবির আধুনিক গানগুলি, যার আরম্ভ 'গীতপঞ্চাশিকা'য় এবং 'গীতি-বীথিকা'য়। পরবর্ত্তী রচনায়—'নব গীতিকা' এবং গীতিমালিকা'র গানগুলিতে এ আদর্শের চরম পরিণতি পরম সৌষ্ঠবে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। এ গানগুলিতে দেখ্‌তে পাই সুরের surprises। শৈলারোহণের সময় মোড় ফিরে অপ্রত্যাশিত প্রকৃতিমাধুর্য্য দেখে মনটা যেমন চম্‌কে ওঠে, এও সেইরকম। কথাগুলো ভালো-মানুষের মতো মগজের এক কোণে চুপ ক'রে পড়েছিল। সুরগুলো নৃত্যচপল ভঙ্গীতে ঘিরে ঘিরে তাকে এমন একটি অপ্রত্যাশিত রূপদান কর্‌লে, যা' দেখে রসিক-চিত্ত বল্‌লে "বাঃ, এরকমটি তো ভাবিনি!" আমার মনে হয় কবি হয়তো নিজেই জানেন না কেমন করে সুরগুলো আপন গতিবেগের প্রেরণায় আপনি decorative designগুলো তৈরী কর্‌ল—যার আরম্ভও নেই, শেষও নেই। যে সুরটা গড়ে উঠ্‌ল, সেটা কালোয়াতিও নয়, বাউলও নয়। তা সম্পূর্ণ খেয়ালী। জ্ঞানলব্ধ দুর্বিবদগ্ধ বল্‌বেন "হেঁয়ালী"।

গান তৈরী কর্‌বার সময় তাঁর কাছে বসে থেকে আমার বারবার মনে হয়েছে যে, সুরের পাগ্‌লামীকে তিনি কিছুতেই দাবিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ছেন না;—খাবার তাড়ায়ওনা, কাজের তাড়ায়ওনা। একটা গানের সুর দিচ্ছিলেন, সেটা হচ্ছে—"একটুকু ছোঁওয়া লাগে"। সুর অভিমানিনী প্রেয়সীর মত মুখ ঘুরিয়ে বস্‌ল, মানভঞ্জনের পালা শেষ ক'রে কবির মন যখন সুরকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে "আচ্ছা নাও, তোমার হাতে আমার বাণী সমর্পণ কর্‌লুম"—অমনি গানটি তৈরী হলো; কথা বল্‌লে আমি ধন্য, সুর বল্‌লে আমি পূর্ণ। আমার মূল বক্তব্য এই গানগুলির সম্বন্ধে এই যে, মধ্যযুগের কবিদের সঙ্গে বাণীর ভাবের মিল থাকৃতে পারে, কিন্তু গান হিসাবে অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টির হিসাবে কবির গানগুলিকে বোধহয় আরও উচ্চস্থান দেওয়া যেতে পারে। অন্ততঃ আমার এই মনে হয়, আর "বুঝিবে কী ধন রসিক যে জন।"

ঋতুসঙ্গীত সম্বন্ধে দু'চার কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করি। "বসন্ত" ও "সুন্দর" এ দু'টী কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। অনেক কবি প্রকৃতির শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে তার জয়গান করেছেন শতমুখে। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য্যলীলার রসমাধুর্য্য উপভোগ ক'রে তার সঙ্গে এমন নিবিড় আত্মীয়তার সম্বন্ধস্থাপন এবং তার রহস্যলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটন আর কোনো কবি করেছেন কিনা জানিনে। প্রত্যেক কিশলয়ের অব্যক্ত

কাকলিতে, প্রতি কুসুমের বর্ণগন্ধময় আত্মনিবেদনে, প্রতি ঋতুসমাগম ও অবসানের মিলনবিরহের বেদনায় কবির মন আনন্দে আকুল ও বিরহে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বাইরের বিরহমিলনের অন্তরালে যে মায়াময় রহস্যলোক রয়েছে, তার অরূপ মাধুর্য্যের সন্ধান, পাওয়া-না-পাওয়ার অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আস্বাদন পেয়ে কবির মন গেয়ে উঠ্‌ল "ও কি এল, ও কি এল না।" গভীর অনুভূতির আনন্দ যেমন মানুষকে সুখদুঃখের, মিলনবিরহের, জন্মমৃত্যুর অতীত অতীন্দ্রিয় আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে, তেমনি প্রকৃতিও অন্তর্নিহিত গভীর সত্তার পরিব্যাপ্ত চৈতন্যে উদ্বোধিত হয়ে প্রাণের নব নব প্রকাশে জয়পরাজয়ের বাণী নিত্যনিয়ত ঘোষণা করছে। এই বিজয়বার্ত্তার সান্ত্বনার বাণী, এই একান্ত আত্মীয়তার রূপ কবির ঋতুসঙ্গীতে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।*

সঙ্গীত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের একান্নবর্ত্তী পরিবার এতদিন সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করছিল। সকালে ঠাকুরপূজো থেকে আরম্ভ করে, শ্রীমণ্ডপের সান্ধ্যসম্মিলনের তাসভাঁজা ও তামাক-সাজা পর্য্যন্ত এমন সুনিয়ন্ত্রিত ছিল যে, দেখে সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করতে হত যে হ্যাঁ—একটা সদ্‌ব্রাহ্মণ বটে বাহ্যিক এবং আন্তরিক দুইপ্রকার শাসনের দৃঢ়বন্ধনে বাড়ির ছেলেমেয়ে বড়-ছোটো এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যে, তাহারা সচল কি অচল—এ প্রশ্ন অদ্যাপি কারো মনে জাগেনি। বাহিরের অশুচিসংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে এমন পবিত্র জীবনযাপন কলিকালে দুর্ল্ভ। অন্তঃপুরচারিণী কুললক্ষ্মীদের অস্তিত্ব এমন রহস্যময় যে, তাঁদের কর্ম্মজীবনের ক্ষুদ্র পরিধির দুর্গপ্রাকার ভেদ করে এমন সাহস বিশ্বচারী আলো-বাতাসেরও ছিল না—মানুষের কলুষদৃষ্টি তো দূরের কথা। এ হেন পরিবারের বহুযত্নগ্রথিত কারাপ্রাচীরের লৌহদ্বারের অর্গল ভেঙে অর্ব্বাচীন ছোক্‌রা এক যখন গ্রাম্য বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে এক লাফে নেমে নিম্ন শ্রেণীর মজুরদের সঙ্গে জুটে, তাদের সর্দ্দার হয়ে Liverpool সহরের নৌকারখানায় পৌঁছল, তখন বাপ তাকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন, মাতৃব্য-পিতৃব্য সবাই তার নরকগমনের পথ সুপ্রশস্ত করলেন, আর ছেলেপিলে-গুলো আমবাগানে ঢুকে বলাবলি করতে লাগ্‌লো—আমরা একবার লুকিয়ে সাহেবের খানসামার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে রুটি-মাখন মুর্গির ডিম খেয়েছিলুম, দাদা বোধহয় রোজ তাই খাচ্ছে,—কি মজা!

Liverpool থেকে বিবিবৌ নিয়ে যখন দেশে ফির্‌ল, বাড়ির চৌকাঠ পেরোবার আগেই বাপ বল্লে—দূর হও! অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র বল্লে—তথাস্তু, তোমার বাঁধন তোমার থাক্‌, আমার পথযাত্রায় আমায় মুক্তি দাও।

অক্ষুব্ধ শান্তিসমুদ্রে অশান্তির ঝঞ্ঝা এসে লাগ্‌লো। দুইয়ের সংঘাতে অন্তরের ও বাহিরের প্রাণতরঙ্গ উদ্বেল হয়ে উঠে তাণ্ডবনৃত্য সুরু করল। বাঁধন গেল ছিঁড়ে, বাধা গেল ধূলিসাৎ হয়ে, আর এই ভগ্নস্তূপের উপর আনন্দযজ্ঞের হোমশিখা দীপ্ততেজে জ্বলে উঠ্‌ল।

---

* শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রপরিচয় সভার ৪র্থ বার্ষিক ৪র্থ অধিবেশনে পঠিত।

নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে বাস করলে বিপদ হয় এই যে, তার ফলে জড়তা ও অবসাদ এসে শান্তি অশান্তির দ্বন্দ্বসম্ভূত সৃষ্টির প্রেরণার উৎসকে আপন সৃজনবেগে অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়। দ্বন্দ্বের ফলেই সৃষ্টি ; সুখদুঃখের আলোড়নের ফলেই আনন্দের চরম প্রকাশ।

আমাদের সঙ্গীতের অবস্থাও কতকটা এইরকম। Classical music বল্‌তে আমরা বুঝি হিন্দী গান। তার বড় বড় ইমারৎ, কেল্লা ফৌজ, তার প্রাকারের পর প্রাকার, প্রাচীরের পর প্রাচীর দেখে স্তম্ভিত হই, বাহবা দিই। প্রাচীন-স্মৃতি-সৌধরক্ষা সমিতি সেগুলি সযত্নে রক্ষা কর্‌চেন, কিন্তু দৈনিক জীবনযাত্রায় সেগুলো কোনো কাজে লাগে না। সেই বিরাট প্রাসাদরচনার মালমশলা নিয়ে নিজের মনের মত করে ছোটখাটো কুটীর রচনা করেই আমার আনন্দ।

লোকসঙ্গীতের ধারা আজও বহমান, কেন না জীবনের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে। প্রাণের সঙ্গে যে সৃষ্টির যোগ নেই, তাকে লোহার সিন্দুকে বন্ধ রাখা চল্‌তে পারে, কিন্তু সর্ব্বমানবের আনন্দযজ্ঞে বিতরণের উপযুক্ত যোগ্যতা তার থাকে না—এটা সর্ব্ববাদীসম্মত।

আমি যখন ভৈরবী সুরের আলাপ করি, তখন বিশ্বের পুঞ্জীভূত ব্যাকুলতার সুর তা'তে বেজে ওঠে ; এই ব্যাকুলতার সকরুণ মিনতির সুর আমাকে অভিভূত করে। মল্লার রাগিণীর যে বিরহবেদনার আকুলতা, তা' সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু আমার বেদনা যখন ভাবরসে অভিসিঞ্চিত হয়ে কথা ও সুরের মিলনে আত্মপ্রকাশ করে, তখন যে ভৈরবী বেজে ওঠে সে আমার ভৈরবী ;—আমার বিরহবেদনায় যে মল্লার বাজে, তা' আমার মল্লার। মালমশ্‌লা যদি ভৈরবী এবং মল্লারেরই থাকে, তবে ইমারৎ যেটা তৈরী হয়, সেটা আমার তৈরী ; তাই তার ভৈরবীতে শুদ্ধ রেখাবও লাগে, কড়ি মধ্যমও লাগে। আমার কারখানায় তৈরী সুরের আনন্দ আমি জগৎকে বিতরণ করছি, কিন্তু আমার কারখানার দ্বারে বড় বড় অক্ষরে জ্বাজ্জ্বল্যমান রয়েছে, "no thoroughfare !" আমার সহমর্ম্মী রসিকের বীণার তারে আমার সুর যে ঝঙ্কার তুল্‌বে, সে ঝঙ্কার আমার সুরের সৌন্দর্য্যের সমগ্র রূপকে অক্ষুন্ন রেখেই বাজ্‌বে।

হিন্দী গানে অধিকাংশ স্থলে সুরকেই প্রাধান্য দেয়, কথাকে নয়। তাই তানের বাহুল্য হিন্দী গানে সম্ভব হয়। বাঙ্‌লা গানে যেখানে কথার আঁটবাঁধুনী, সেখানে খোঁচখাঁচ মীড় ছাড়া তান চলে না। হিন্দী গানে সেই জন্য সারগমও ঢোকানো সম্ভব, কেন না গাইবার সময় গায়ক রসবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও জানিয়ে দেন যে—দেখ্‌ছো, আমি যেটা গাচ্চি এটা গুণক্রী, পূরবী নয় ; কেননা শুন্‌লে তো নিখাদবর্জ্জিত আর কড়ি মধ্যমও লাগাই নি।

কিন্তু আমার মন যখন গায় "জননী তোমার করুণ চরণখানি হেরিনু আজিকে অরুণ কিরণরূপে"—তখন আমার সুরলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেন "লাগুক্ নিখাদ ও কড়িমধ্যম, কথায় সুরে মিলেছে খাসা ; নাহয় গুণক্রী না হয়ে নিগুর্ণক্রীই হল, কুছ পরোয়া নেহি।"

হিন্দীগানে সেই জন্যে একথা বলে দেবার প্রয়োজন হয় যে—আমি পূরবী গাচ্চি। সেই পূরবীর বিশেষ ঠাটকে আশ্রয় করে আমার গান গাওয়া হল ; কথার মধ্যে দিনান্তের করুণ মিনতির আভাসমাত্র

নেই বলে সুর গেয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয় যে, এটা দিন অবসানে গাওয়া উচিত ; প্রকৃতির বুকের ভিতরকার কান্নার সুর আমি পূরবী রাগিণীতে রূপান্তরিত করেছি। কিন্তু আমি যখন গাই :—

"বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে
সন্ধ্যা বায়ে, শ্রান্ত কায়ে, ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে"

তখন সুরটা পূরবী হতে বাধ্য, কিন্তু বল্‌বার কোনো প্রয়োজন নেই, এবং তা'তে শুদ্ধ ধৈবত লাগালেও সৌন্দর্য্যর লাঘব হয় না।

বাঙলা গানে যেখানে-সেখানে তান দেওয়া যায় না এই জন্যে যে, বাঙ্‌লা গানের কথারও একটা ঠাস্‌বুনানী আছে ; তার সুরকে বাদ দিলেও কথার নিজস্ব রসসম্পদ রয়েছে। কাজেই একটা কথা শেষ করে বাকি কথাটা না বল্লে, উক্ত কথা বড় বিপদে পড়ে। কেমন হয় জানো ? যেমন, আমি যদি গাই "যদি বেলা যায় গো বয়ে" আর তারপরে যদি ক্রমাগত বল্‌তে থাকি "যায় গো বয়ে"; তাহলে তার পরের দুই লাইন

"জেনো জেনো
আমার মন রয়েছে তোমায় লয়ে"

চীৎকার করে বল্‌তে থাক্‌বে— ওহে, থামহে, আমার কথাটাও বলে ফেলো, তাহলে অর্থটাও সম্পূর্ণ হয় আর লোকেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

আজকাল আর একটা কথাও উঠেছে যে, একটা গান বারবার একইরকম করে গাইলে এক-ঘেয়ে হয়ে যায়, তাই প্রতিবার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা দরকার।

এর সম্বন্ধে বলা যেতে পারে ঐ একই কথা যে পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন হিন্দী গানেতেই চলে ; কেন না হিন্দী গানে কথা ও সুর মিলে একটা সুসম্বদ্ধ অখণ্ড রূপ গ্রহণ করে না। গাইচি গুরুগম্ভীর রাগিণী—সুহা কানাড়া ; তাতে কথা বসালুম "বল্‌মা রে চুনরিয়া ময়্যকো লাল রঙাদে", অর্থাৎ "হে বল্লভ, আমার ওড়নাটা লাল রঙে রঙিয়ে দাও"। এ চুনরিয়াকে কুরুসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত ক্রমাগত টান মারা চল্‌তে পারে ; কিন্তু ঐ সুরই বাঙ্‌লা কথায় খাপ খাইয়ে "নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও" গাইবার সময় সে টান সইবে না।

আমি যখন শিল্পীর আসনে অধিষ্ঠান করে রসসৃষ্টি করচি, তখন তার ছাপটা নষ্ট ক'রে নিজের কার্‌দানী দেখানোকে বলা যায় অনধিকার বা মূঢ়তা। গোলাপ যে ফুটেছে, সে গোলাপই থাক্‌বে ; তা'তে বেলফুলের শুভ্রতা ও সৌরভ আশা করার মত এমন পাগ্‌লামী আর কিছু হ'তে পারে না। এক সুরে গাইলে যদি গান একঘেয়ে হয়, তবে দোষ হয় গায়কের নয়—শ্রোতার। আর দুইয়েরই যদি দোষ না না থাকে, তবে তা Thing of beauty নয়, এবং joy for ever দাবী সে করতে পারে না। তোমার যদি সাদা রসগোল্লা রোজ ভাল না লাগে, অতুলের দোকানে কড়াপাকের রসগোল্লার ফরমাস দাও। কিন্তু বেচারী সাদা রসগোল্লাকে সাদাই থাক্‌তে দাও। তোমার না ভালো লাগে, আর কারও ভালো লাগ্‌তে

পারে; পৃথিবী থেকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত এখনও লুপ্ত হয়নি। তা' না করে তুমি যদি গায়ের জোরে সাদা রসগোল্লায় গুড় মেশাও, তবে রসগোল্লার রসত্ব এবং গুড়ের গুড়ত্ব দুই-ই মাঠে মারা যাবে। আর মিষ্টি যদি একেবারেই ভাল না লাগে, তবে বুঝতে হবে পিত্তাধিক্য হয়েছে, চিকিৎসার দরকার।

আমার মন বল্‌চে কথায় ও সুরে মিলিত একটি অখণ্ড সুসম্পূর্ণ রসসৃষ্টি করব। সেটা যখন হ'ল, তখন দেখা গেল যে সুরে টোড়ির আমেজ এসেছে। এসে থাকে যদি তবে "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও।" সে টোড়ি যদি জীবনপুরী না হয়ে বোলপুরী হয়—তাতেই বা ক্ষতি কী?

ছাত্র ও বন্ধুবর্গের খাতায় স্বাক্ষরিত খণ্ডকবিতা

১

বাণী যার নাহি পায় কূল
সুর সেথা করে তার খেলা,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে সে দোদুল
সকল বাঁধন করি হেলা।

২

যে নারী সবার তরে অকাতরে করে প্রেম দান
অক্ষয় ভাণ্ডার তার, কাজ তার চিরদীপ্তিমান।
মানের রাখেনা আশা, ভাষা তার সুনিপুণ সেবা;
চিত্তজয়ী রাজ্ঞী সে যে, আপনার ও পর তার কেবা।

৩

পূর্ণ চাঁদ নীলাকাশে
সে যে ক্ষণিকের
বদনে যে শশী হাসে
মর্ত্ত্য গেহের,
সে দীপ্তি হাসিমুখে
করে অনুক্ষণ
চিরানন্দে সুখে দুখে
সুধা বরিষণ॥

৪

বাণীমন্দিরের তুমি নবীনা পূজারী।
প্রবীণ যুবার অর্ঘ্য
ধরায় এনেছে স্বর্গ,
মন্দার স্তবক রচি তারি'
সমর্পিনু কম করে,
জানি তুমি লবে তারে তৃপ্ত সমাদরে।
কাব্যরসে যদি বসে মন
সফল হইবে দান, দাতা মহানন্দে নিমগন।
দিন করে প্রাণ ভরে শুভ আশীর্ব্বাদ
মিটুক সকল আশা, পূর্ণ হোক সাধ।

৫

কাব্যবাঁধনে চাহি বাঁধিতে সুমিত্রা
মিল নাহি খুঁজে পাই, অক্ষর অমিত্রা।
মাইকেলি ধরণে যদি লিখি কাব্য,
অনভ্যাস কারণে তা হ'বে অশ্রাব্য।
"দাদামশাই" তাই দুর্ব্বিপাক গণি
হৃদয়ে রাখিল তার হৃদয়ের "মণি"

৬

লেখা থাকে, যায় লোক।
রাখে স্মৃতি আর শোক॥
খাতার পাতায় যা তা দিলুম লিখে।
যতন ক'রে রেখো খাতা, যদিন থাকে টিঁকে॥
অচেনারে চেনা হোলো, চেনারে অচেনা।
এইমতে পাওনার মেটে শুধু দেনা॥

অধ্যাপক দিনেন্দ্রনাথ—শান্তিনিকেতন

সঙ্গীতগুরু দিনেন্দ্রনাথ—শান্তিনিকেতন

দিনেন্দ্র স্মরণে

দিনেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অকস্মাৎ কাল দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ আশ্রমে এসে পৌঁছল। শোকের ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে আনুষ্ঠানিকভাবে যে শোকপ্রকাশ করা হয়, তার প্রথাগত অঙ্গ যেন একে না মনে করি। বর্ত্তমান ছাত্রছাত্রীরা সকলে দিনেন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে জানত না—কর্ম্মের যোগে সম্বন্ধও তাঁর ইদানীং এখানকার অল্প লোকের সঙ্গেই ছিল। অধ্যাপকেরা সকলেই এক সময়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ও তাঁর সঙ্গে স্নেহপ্রেমের সম্বন্ধ তাঁদের ঘনিষ্ঠ হ'তে পেরেছিল।

যে শোকের কোনো প্রতিকার নেই, তাকে নিয়ে সকলে মিলে আন্দোলন ক'রে কোনো লাভ নেই; এবং আত্মীয়বন্ধুদের যে-শোক, অন্য সকলের মনে তার সত্যতাও প্রবল নয়। এই মৃত্যুকে উপলক্ষ্য ক'রে মৃত্যুর স্বরূপকে চিন্তা করবার কথা মনে রক্ষা করা চাই। সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত ক'রে এমন কোনো কোণ নেই, যেখানে প্রাণের সঙ্গে মৃত্যুর সম্বন্ধ লীলায়িত হচ্ছে না; এই যে অনিবার্য্য সঙ্গ, এ যে শুধু অনিবার্য্য তা নয়, এ না হ'লে মঙ্গল হ'ত না।—দুঃখকে মানতেই হবে; শোক দুঃখ, মিলন বিচ্ছেদ, উন্মীলন নিমীলনেই সমাজ গ্রথিত, —এই আঘাত অভিঘাতের মধ্যে দিয়েই সৃষ্টির প্রক্রিয়া চল্‌ছে। এর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, যে কঠোরতা আছে, সেইটি না থাকলেই যথার্থ দুঃখের কারণ হ'ত। সমস্ত জগৎ জুড়ে মানুষের মধ্যে অপরিসীম দুঃখ, আমরা তার সৃষ্টির দিকটা, মহত্ত্বের দিকটাই দেখব; তার মধ্যে যে অপরাজিত সত্য, সে তো অবসন্ন হয় না—অথচ মানুষের দুঃখের কি অন্ত আছে? মৃত্যুকে যদি বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখি, তাহ'লেই আমরা অসহিষ্ণু হয়ে নালিশ করি—এর মধ্যে মঙ্গল কোথায়? এই দুঃখের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত আছে, নইলে দুর্ব্বলতায় সৃষ্টি অভিভূত হ'ত—দুঃখ আছে ব'লেই মনুষ্যত্বের সম্মান। দুঃখের আঘাত বেদনা মানুষের জীবনে নানান কান্নায় প্রকাশ; ইতিহাসের মধ্যে যদি দেখি, তাহ'লে দেখব অপরিসীম দুঃখকে আত্মসাৎ ক'রে মানুষ আপন সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সে সব এখন কাহিনীতে পরিণত। ইতিহাসে কত দুঃখপ্লাবন ঘটেছে, কত হত্যাব্যাপার, কত নিষ্ঠুরতা—সে সব বিলুপ্ত হয়েছে; রেখে গেছে দুঃখবিজয়ী মহিমা, মৃত্যুবিজয়ী প্রাণ।—মৃত্যুর সম্মুখ দিয়ে প্রাণের ধারা চলেছে—এ নাহ'লে মানুষের অপমান হ'ত। মৃত্যুর স্বরূপ আমরা জানিনে ব'লে কল্পনায় নানা বিভীষিকার সৃষ্টি করি। প্রাণলোককে মৃত্যু আঘাত করেছে, কিন্তু বিধ্বস্ত করতে পারে নি—প্রাণের প্রকাশের অন্তরালের মৃত্যুর ক্রিয়া, প্রাণকে সে-ই প্রকাশিত করে। সম্মুখে প্রাণের লীলা, মৃত্যু আছে নেপথ্যে।

অনেকে ভয় দেখায় মৃত্যু আছে, তাই প্রাণ মায়া। আমরা বলি, প্রাণই সত্য, মৃত্যুই মায়া ; মৃত্যু আছে তৎসত্ত্বেও তো যুগে যুগে কোটি কোটি বর্ষ ধ'রে প্রাণ আপনাকে প্রকাশিত ক'রে আসছে। মৃত্যুই মায়া। এই কথা মনে ক'রে দুঃখকে যেন সহজে গ্রহণ করি ; দুঃখ আছে, বিচ্ছেদ ঘটল, কিন্তু এর গভীরে সত্য আছে—এ কথা যেন স্বীকার ক'রে নিতে পারি।

আশ্রমের তরফ থেকে দিনেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যা বলবার আছে, তাই বলি। নিজের ব্যক্তিগত আত্মীয়বিচ্ছেদের কথা আপনার অন্তরে থাক্—সকলে মিলে তা আলোচনা করার মধ্যে অবাস্তবতা আছে, তাতে সঙ্কোচ বোধ করি। আমাদের আশ্রমের যে একটি গভীর ভিত্তি আছে, তা সকলে দেখতে পান না। এখানে যদি কেবল পড়াশুনোর ব্যাপার হ'ত তাহ'লে সংক্ষেপ হ'ত, তাহ'লে এর মধ্যে কোনো গভীর তত্ত্ব প্রকাশ পেত না। এটা যে আশ্রম, এটা যে সৃষ্টি, খাঁচা নয় ; ক্ষণিক প্রয়োজন উত্তীর্ণ হ'লেই এখানকার সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হবে না, সেই চেষ্টাই করেছি। এখানকার কর্ম্মের মধ্যে যে-একটি আনন্দের ভিত্তি আছে, ঋতু-পর্য্যায়ের নানা বর্ণগন্ধগীতে প্রকৃতির সঙ্গে যোগস্থাপনের চেষ্টায়, আনন্দের সেই আয়োজনে দিনেন্দ্র আমার প্রধান সহায় ছিলেন। প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম, তখন চারিদিকে ছিল নীরস মরুভূমি—আমার পিতৃদেব কিছু শালগাছ রোপণ করেছিলেন, এ ছাড়া তখন চারিদিকে এমন শ্যাম শোভার বিকাশ ছিল না। এই আশ্রমকে আনন্দনিকেতন করবার জন্য তরুলতার শ্যাম শোভা যেমন, তেমনি প্রয়োজন ছিল সঙ্গীতের উৎসবের। সেই আনন্দ উপচার সংগ্রহের প্রচেষ্টায় প্রধান সহায় ছিলেন দিনেন্দ্র। এই আনন্দের ভাব যে ব্যাপ্ত হয়েছে, আশ্রমের মধ্যে সজীবভাবে প্রবেশ করেছে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে, এর মূলেতে ছিলেন দিনেন্দ্র। আমি যে সময়ে এখানে এসেছিলাম, তখন আমি ছিলাম ক্লান্ত; আমার বয়স তখন অধিক হয়েছে—প্রথমে যা পেরেছি, শেষে তা-ও পারিনি। আমার কবি-প্রকৃতিতে আমি যে দান করেছি, সেই গানের বাহন ছিলেন দিনেন্দ্র। অনেকে এখান থেকে গেছেন, সেবাও করেছেন ; কিন্তু তার রূপ নেই ব'লে ক্রমশ তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু দিনেন্দ্রের দান এই যে আনন্দের রূপ, এ তো যাবার নয়—যতদিন ছাত্রদের সঙ্গীতে এখানকার শালবন প্রতিধ্বনিত হবে, বর্ষে বর্ষে নানা উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন চলবে, ততদিন তাঁর স্মৃতি বিলুপ্ত হ'তে পারবে না, ততদিন তিনি আশ্রমকে অধিগত ক'রে থাকবেন ; আশ্রমের ইতিহাসে তাঁর কথা ভুলবার নয়। এখানকার সমস্ত উৎসবের ভার দিনেন্দ্র নিয়েছিলেন, অক্লান্ত ছিল তাঁর উৎসাহ। তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'রে কেউ নিরাশ হয়নি—গান শিখতে অক্ষম হ'লেও তিনি ঔদার্য্য দেখিয়েছেন—এই ঔদার্য্য না থাকলে এখানকার সৃষ্টি সম্পূর্ণ হ'ত না। সেই সৃষ্টির মধ্যেই তিনি উপস্থিত থাকবেন। প্রতিদিন বৈতালিকে যে রসমাধুর্য্য আশ্রমবাসীর চিত্তকে পুণ্যধারায় অভিষিক্ত করে, সেই উৎসকে উৎসারিত করতে তিনি প্রধান সহায় ছিলেন। এই কথা স্মরণ ক'রে তাঁকে সেই অর্ঘ্য দান করি, যে-অর্ঘ্য তাঁর প্রাপ্য।*

* শান্তিনিকেতনের মন্দিরে ৫ই শ্রাবণ, ১৩৪২, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ।

দিনেন্দ্রনাথ

শ্রীঅমিতা সেন, বি-এ

শেলী একটি ছোট কবিতায় বলেছেন—

"Music, when soft voices die,
Vibrates in the memory,
Odours, when sweet violets sicken,
Live within the sense they quicken."

গুণীর গান যখন থেমে যায়, কোমল সুরের মীড়গুলি নীরব হয়ে যায়, সুরের রেশটি তখনও শ্রোতার প্রাণের মধ্যে অনুরণিত হ'তে থাকে। ফুল ঝরে যায়, সৌরভ তখনও মনকে আকুল করে।

এই পৃথিবীর প্রাঙ্গণে বহু জনের সঙ্গেই ত আলাপপরিচয় হয়, কিন্তু দৈবাৎ এক-একটি মানুষের দেখা মেলে—যাঁদের হৃদয়ের সৌরভ, তাঁরা দূরে চ'লে গেলেও, প্রাণকে নিবিড় অনুভূতিতে পূর্ণ ক'রে রাখে।

আমাদের দিনুদা ছিলেন এম্‌নি একজন মানুষ। যে কেউ তাঁর কাছে গিয়েছে, তাকেই তিনি স্বতঃশ্রুত নিবিড় স্নেহে আপ্লুত করেছেন। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-গুণী, অখ্যাত-অজ্ঞাতের ভেদ সে স্নেহের কাছে ছিল না। সহজে ভালবাসবার এক আশ্চর্য্য দুর্লভ ক্ষমতা নিয়ে তিনি এসেছিলেন ; যতদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন, অকৃপণভাবে অযাচিতভাবে বিলিয়ে গিয়েছেন তাঁর নির্ম্মল মধুর অনাবিল ভালবাসা। তাই আজ তাঁর অভাব আমাদের কাছে এমন গভীর, এমন নিবিড়, এমন প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিয়েছে।

দিনেন্দ্রনাথের অতি নিকটে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সঙ্গীতশিক্ষা নিয়েই এই পরিচয়ের শুরু, তারপর সেই পরিচয় তাঁর স্বাভাবিক স্নেহের আকর্ষণে অতি অল্পকালের মধ্যেই আত্মীয়তায় পরিণত হয়েছে। যদিও জানি, যতখানি তাঁর কাছে পেয়েছি তার কিছুই প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই ; তবু তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে তাঁর স্নেহের মধ্যে, তাঁর অতীত স্মৃতির মধ্যে নিজেকে অনুভব ক'রে নেবার একটু সান্ত্বনা, একটু তৃপ্তি আছে।

প্রথম যখন বোলপুরে যাই, আমার বয়স তখন নয় বৎসর মাত্র। দিনুদার বিরাট শরীর দেখে, তাঁর সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে, তাঁকে একটু ভয়ে ভয়ে এড়িয়েই চল্‌তাম। কিন্তু কিছুদিন মধ্যেই বুঝতে পারা গেল যে, মানুষটি নিতান্তই আমাদের দলের লোক। সেই সময় তিনি শিশু-বিভাগের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে "বাল্মীকি প্রতিভা" গীতাভিনয় করাচ্ছিলেন। দেখেছি তিনি শিশুর দলে শিশু হয়ে মিশে যেতেন, কোথাও বাধ্‌ত না। শিশুরাও তাঁকে চিনে ফেলেছিল। আমরা ছোট ছেলেমেয়েদের দল তাঁর কোলের কাছে ব'সে গান শিখতাম; দস্যুদলের গানগুলো ছেলেরা যেমন উপভোগ করত, তিনিও তেমনিই মনেপ্রাণে

উপভোগ করতেন, এবং অন্যের কাছেও উপভোগ্য ক'রে তুলতেন। দস্যুদলের সঙ্গে লম্ফঝম্ফ ক'রে তাদের যখন অভিনয় শেখাতেন, তখন তাঁকেও একটি বিরাট শিশু বলেই মনে হ'ত; আবার বালিকার পাঠ শেখাবার সময়ে তাঁর অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বরে ও করুণরসের অভিনয়ে সকলে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। এই সময়ে আশ্রমবাসী আবাল-বৃদ্ধ প্রত্যেকেই, "শিশু-বিভাগের ঘরে দিন্‌দা এসেছেন", এই খবরটি কানে গেলে আর স্থির থাক্‌তে পারতেন না, কাজ ফেলে ছুটে আসতেন। এই গীতিনাট্যটি একমাত্র তাঁরই শিক্ষার গুণে সুঅভিনীত হয়েছিল।

এই অভিনয় হয়ে যাবার পর আমি দিনেন্দ্রনাথের কাছে নিয়মিতভাবে গান শিখতে আরম্ভ করি। আরও অনেকেই তাঁর কাছে গান শিখতে আসতেন, এবং সেই সূত্রেই তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করেছেন।

গান শেখাবার সময়ে দিনেন্দ্রনাথ সাধারণতঃ কোনও যন্ত্র ব্যবহার করতেন না। গান গেয়ে যেতেন, আমরা দুই-একবার শুনে পরে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গানটি গাইতাম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গানের সুরের প্রত্যেকটি সূক্ষ্মতম কাজ আমাদের সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত না হ'ত, ততক্ষণ কিছুতেই তিনি নিরস্ত হ'তেন না। সকল ছেলেমেয়ের শেখবার ক্ষমতা সমান ছিল না, কিন্তু কখনও তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌তে দেখিনি। কিছুতেই যেন তাঁর বিরক্তি হ'ত না, কেবল একটি বিষয় ছাড়া;—সে আর কিছু নয়, ভুল সুর তাঁর কানে গেলে তিনি সইতে পারতেন না। যতক্ষণ সেটাকে শুধ্‌রে ঠিক সুরে গাওয়াতে না পারতেন, ততক্ষণ যেন শিশুর মতই চঞ্চল হয়ে পড়তেন। গানে তাঁর ক্লান্তি কখনও দেখিনি।

তিনি কারও সাম্‌নে নিজেকে জাহির করতে ভালবাস্‌তেন না। অতবড় সঙ্গীতজ্ঞ হয়েও গান করতে বল্‌লে যেন কতকটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন। তাঁর মধুর গম্ভীর কণ্ঠ যে শ্রোতার পক্ষে এক অপরূপ বিস্ময় ছিল, এ কথা স্পষ্ট ক'রে কেউ বল্‌তে গেলেই যেন অত্যন্ত সঙ্কোচবোধ করতেন। অনেক ব'লেকয়েও যখন গান তাঁকে দিয়ে গাওয়াতে পারা যেত না, তখন একটা ওষুধ ছেলেরা বের করেছিল। রবীন্দ্রনাথের একটা গান অত্যন্ত বিকৃত করে গাইতে আরম্ভ করলেই আর রক্ষা ছিল না, খানিকক্ষণ ছট্‌ফট্‌ ক'রে শেষে আর থাক্‌তে না পেরে, "থাম্ থাম্, ও কি হচ্ছে?" ব'লে চেঁচিয়ে উঠতেন,—তার পর গানের পালা সুরু হ'তে আর বিলম্ব ঘট্‌ত না।

ছল, চাতুরী, কপটতা তাঁকে কখনও স্পর্শ করেনি। শিশুর স্বচ্ছতা তাঁর চোখে মুখে জ্বল্‌জ্বল্‌ করত, সেই চিরনবীন শৈশব নিয়েই তিনি চলে গেছেন।

গানের ক্লাস করতে গিয়ে শুধু গানই হ'ত না। তাকে ক্লাস বললে ক্লাসের চপলতাপরিশূন্য স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য এবং ক্লাসের কর্ণধার-মহাশয়ের অভ্রভেদী মর্য্যাদা এবং শব্দভেদী প্রতিষ্ঠার মাহাত্ম্য নিশ্চয় ক্ষুণ্ণ হবে। গানশেখা হয়ে যাবার পর দিন্‌দা নানারকমের গল্প করতেন; শুধু দিন্‌দাই নয়, আমরাও তাঁর সঙ্গে গল্প করতাম—অসঙ্কোচে গল্প করতাম। কোথাও বাধা ছিল না—না বয়সের, না জ্ঞানের, না অনুশাসনের। ছোটদের সঙ্গে তিনি এমনই প্রাণ খুলে গল্প করতে ভালবাসতেন। আমি একদিন

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "হ্যাঁ দিন্‌দা, আপনি ত অতবড়, তবে আমাদের মত ছোটদের সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসেন কেন?" হেসে বল্‌লেন, "দেখ্, ছোটদের সঙ্গেই আমার বেশী মেলে; যারা খুব প্রবীণ, খুব পাকা, তাদের কাছে গেলেই ভয়ে আমার কেমন সব ঘুলিয়ে যায়।"

গানের ক্লাস করতে গিয়ে অনেক সময়ে তাঁর কাছে অনেক বইও পড়েছি। দিনেন্দ্রনাথকে সকলে সঙ্গীতবিশারদ বলেই জানেন; কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না যে তিনি নানা ভাষাবিৎ ছিলেন, নানা বিষয়ে তাঁর অভিনিবেশ ছিল। অধ্যয়ন তাঁর জীবনের একটা বিশেষ আনন্দের আশ্রয় ছিল। কয়েকটি ভাষা তিনি নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। তার মধ্যে ফার্সী, সংস্কৃত ও মৈথিলী ব্রজবুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতন ছেড়ে আস্‌বার বছর দুই আগে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি ফার্সী পড়তে আরম্ভ করেন, এবং হাফেজ থেকে কবিতা বাংলা-কবিতায় অনুবাদ করেন। সে কবিতায় বড় চমৎকার সুর দিয়েছিলেন। দিনেন্দ্রনাথের বিশেষ উৎসাহের বিষয় ছিল নানা দেশের ইতিহাস ও ভূগোল। "Geographical Magazine" খুলে নানা দেশের ভূবৃত্তান্ত পড়তেন, ছবি দেখতেন, আর বল্‌তেন, "দেখ্, দেশভ্রমণ করবার বড় সখ ছিল। সে তো আর পূর্ণ হ'ল না, তাই এই সব দেখেই দুধের সাধ ঘোলে মেটাই।"

নাট্যকলায় তাঁর দক্ষতার কথা আগেই বলা হয়েছে। "ফাল্গুনী," "বিসর্জ্জন," "রাজা" প্রভৃতি নাটকে তাঁকে রঙ্গভূমির উপরে যিনিই দেখেছেন, তাঁকে আর এ বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। আবৃত্তিও যে তাঁর আশ্চর্য্য সুন্দর হবে, সে ত সহজেই অনুমান করা যায়। কত কবিতা তাঁর মুখে শুনেছি। তিনি অত্যন্ত কাব্যানুরাগী ছিলেন। বই খুলে একবার বল্‌লেই হ'ল—"পড়ুন না দিন্‌দা!" কি আশ্চর্য্য ক'রেই না তিনি আবৃত্তি করতেন! তাঁর মুখে কবিতা শুন্‌লে সেটি আর ব্যাখ্যা ক'রে বুঝবার দরকার হ'ত না। আমরা ছিলাম যেন তাঁর মধুচক্র। নিজে তিনি কবিতাটির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করতেন, এবং কাব্যমঞ্জরীর অনাস্বাদিত মধুরস আহরণ ক'রে আমাদের শিশুচিত্তকোষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ক'রে তুল্‌তেন সেই মধুরস।

কেবল তাই নয়। সময়ে সময়ে তাঁর ক্লাসে রসনাতৃপ্তিকর রস-পরিবেষণেরও ব্যবস্থা হ'ত।—শুধু চাওয়ার অপেক্ষা। এমন ক্লাস আর কোথাও কেউ পায়নি।

এম্‌নি ভাবে গানে-গল্পে, হাসিতে-আমোদে, পাঠে-আবৃত্তিতে, সব দিক দিয়ে তিনি একটি রসচক্র রচনা ক'রে রেখেছিলেন।

তা'বলে যেন কেউ মনে না করেন, তাঁর ক্লাসে শুধু মজাই হ'ত, বা কাজে অবহেলা ক'রে তাঁর সঙ্গে আমরা কেবল হাসিঠাট্টা করতে পেতুম। লেশমাত্র শৈথিল্য তিনি ঘট্‌তে দিতেন না। যে-সময়ে যে কাজটি করবার কথা, ঠিক সেই সময়ে সেই কাজ তিনি নিজে করতেন, অন্যকে দিয়েও করাতেন। দুপুরবেলা কলাভবনে একটার সময় দিন্‌দার রিহার্সেল নেবার কথা; আমরা সব কে কোথায় আছি একটু দিবানিদ্রার চেষ্টায়,—ঠিক সেই সময় রৌদ্রের ঝাঁঝ মাথায় ক'রে দিন্‌দা এসে উপস্থিত; আর এসেই

হাঁকডাক সুরু ক'রে দিতেন। ভয়ে ভয়ে আমরা তাড়াতাড়ি খাতাপত্র হাতে এসে জুটলে, গান সুরু হ'ত। প্রত্যেকের খাতায় গানগুলি ঠিকমত তুলে নেওয়া চাই, ফাঁকি দিয়ে কাজ ফেলে রেখে, এর কাঁধের উপর দিয়ে, ওর পিঠের উপর দিয়ে দেখে কোনমতে কাজ সারলে চলবে না। পঁচিশ-ত্রিশ জনকে একসঙ্গে গান শেখাতে বসেও দিন্‌দার কান পড়ে আছে সুরের নিখুঁত টানের উপরে—কোন্ কোণায় কে এতটুকু বেসুর ক'রে ফেল্‌ল, তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলতেন; আর আগেই যেমন বলেছি,—ঠিক সুরটি আয়ত্ত না-করা পর্য্যন্ত কিছুতেই তার নিস্তার ছিল না। দিন্‌দাকে আমরা ভালবেসেছি, তাঁকে না-ভালবাসা আমাদের সম্ভব ছিল না; কিন্তু সেই ভালবাসার সুবিধা নিয়ে তাঁর প্রতি কোনো চপলতা, কোন অ-সমীহতা প্রকাশ করার রাস্তা আমাদের ছিল না। বিপুল একটা সাগরগম্ভীর ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল, যার সামনে এলে শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে মাথা আপনিই নত হয়ে যায়।

বড় গায়ক এবং রবীন্দ্রনাথের "সকল গানের ভাণ্ডারী" বলেই দিনেন্দ্রনাথকে সকলে জানেন। কিন্তু তাঁর একটু বিশেষত্ব ছিল, সেটি স্পষ্ট উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি।

সাধারণতঃ বড় গায়করা এক-একজন সঙ্গীতকলার এক এক বিশেষ দিকে দক্ষতা অর্জ্জন করেন কেউ ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের এক ভাগ, কেউ অন্য ভাগ ভাল জানেন; কেউ করেন কীর্ত্তন, কেউ বা বাউল ভাটিয়ালী প্রভৃতি লোকসঙ্গীতেই মাতিয়ে দেন। বাংলা গানের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে,—রবীন্দ্রনাথের গানের একটা বৈশিষ্ট্য, আবার সুরসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের আর একরকমের কায়দা। এই সব বৈচিত্র্য অনুসারে গুণীদেরও শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে।

(দিনেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব ছিল এই যে, সবরকমের গানই তিনি অনায়াসে এবং দক্ষতার সঙ্গে গাইতে পারতেন। ক্লাসিক্যাল হিন্দী সঙ্গীতেও তিনি অল্প শিক্ষা অর্জ্জন করেন নি। বাউল ভাটিয়ালী গাইবার সময় মেঠো সুরের আদিম ও অকৃত্রিম ভাবটি কেমন অনায়াসে তিনি প্রকাশ করতেন। না, আপনিই তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আস্‌ত, চেষ্টা ক'রে কিছুই যেন তাঁকে করতে হ'ত না। কীর্ত্তন তাঁর মুখে শুন্‌লে চোখে জল আস্‌ত। আবার দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান গাইবার জুড়ি তাঁর কেউ ছিল কি না, আমি জানিনে। এ কথা বল্‌লে বোধহয় অনেকের কাছেই আশ্চর্য্য লাগ্‌বে যে, ছেলেবেলায় দিনেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন; এবং নিজের গানগুলি তাঁর মুখে শোনাবার জন্যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে নিয়ে বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন।

শুধু ভারতীয় সঙ্গীতেই নয়, ইউরোপীয় সঙ্গীতেও দিনেন্দ্রনাথের জ্ঞান ও দক্ষতা ছিল। বিলাতে এই সঙ্গীতের মোহে আকৃষ্ট হ'য়েই তাঁর ব্যারিষ্টার হওয়া আর ঘটে ওঠেনি। ইউরোপীয় সঙ্গীতজ্ঞ যাঁরা ভারতীয় সঙ্গীতের রস আস্বাদন করতে চেয়েছেন, তাঁরা দিনেন্দ্রনাথের শিষ্যত্বলাভে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেছেন।

দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি তাঁকে অমর ক'রে রাখ্‌বে। স্বরলিপি লিখ্‌তে তাঁকে দেখেছি চিঠিলেখার মতন; কোনো যন্ত্রের সাহায্য নিতেন না, গুন্-গুন্ করেও গাইতেন না, সুর তাঁর মাথার মধ্যে

খেলা ক'রে বেড়াত, তিনি শুধু কাগজেকলমে তার প্রতিলিপি লিখে যেতেন অতি সহজে, অবলীলাক্রমে,—সেও যেন এক খেলা। খুব ছোটবেলায় লোরেটো স্কুলে পড়বার সময় তিনি স্কুলে পিয়ানোর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর এস্রাজ-বাজানো যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা কখনও ভুলতে পারবেন না। এস্রাজ বাজিয়ে আপন মনে যখন গান করতেন, তখন গঙ্গাযমুনার ধারার মত যন্ত্র ও কণ্ঠনিঃসৃত সুরের ধারা এক হয়ে মিশে যেত।

এইবার তাঁর একটি দিকের কথা বল্‌ব, যে-কথা তিনি ফুলের গোপন মধুগন্ধের মতন নিজের ভিতরেই লুকিয়ে রেখেছিলেন,—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রতি সম্ভ্রম এবং নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত অতিরিক্ত সঙ্কোচবশতঃ কিছুতেই তিনি তাঁর নিজের লেখা প্রকাশ হ'তে দেন নি। তাঁর অবর্ত্তমানে, বিশেষতঃ তাঁর বিনা-অনুমতিতে, সেটি প্রকাশ ক'রে তাঁর স্মৃতির প্রতি কোনো অপরাধ করছি কি না, আমি জানিনে। কিন্তু এটি এমনই মধুর জিনিষ যে, সকলকে এর ভাগ দিতে না-পার্‌লে তৃপ্তি হয় না, সে-জন্যে সে অপরাধ স্বীকার করেই নিলাম; জানি, তাঁর গভীর স্নেহের কাছে আমার সব চপলতা, সমস্ত প্রগল্‌ভতার ক্ষমা আছে।

তিনি একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন। তাঁর পিতামহ স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের মতন তিনিও রাশি রাশি ফুল ফুটিয়ে দক্ষিণে হাওয়ায় সব ঝরিয়ে দিতেন—কিছুই সঞ্চয় করতেন না, একটি কুঁড়িও না। কত অজস্র কবিতা তিনি লিখেছেন—আমরা তাঁর হাতবাক্স খুলে টেনে বার করেছি—তখন হয়ত প'ড়ে শুনিয়েছেন। কিছুদিন পরে জিজ্ঞাসা করলাম, "কই দিন্‌দা, আপনার সেই কবিতাটা?" নিশ্চিন্ত মুখে বললেন, "ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি ত।" শুনে আমরা খুব রাগ করতাম। দু-একটি কবিতা রয়ে গেছে—বাংলা কাব্যসাহিত্যে অতুলনীয়। বই ছাপাতে বললে বল্‌তেন, "দেখ, ছাপানোর মোহ একটা বড্ড নেশা—ওর মধ্যে না-যাওয়াই ভাল। ছাপিয়ে কি হয়? এই ত, আমি পড়লুম, তুই শুন্‌লি, বেশ হ'ল; আবার কি?"

নিজের রচনা সম্বন্ধে দিনেন্দ্রনাথের এই পরিপূর্ণ আসক্তিহীনতায় রবীন্দ্রনাথের "হে বিরাট নদী"র কয়েকটি চমৎকার লাইন মনে করিয়ে দেয়ঃ—

"কুড়ায়ে লও না কিছু, করনা সঞ্চয়,
নাহি শোক, নাহি ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়,
যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি, সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।

একদিন দেখি আল্‌মারীতে নানা বইয়ের মধ্যে "বীণ" ব'লে ছোট্ট একখানি বই। তার ইতিহাসও একদিন শুন্‌লাম, ছেলেবেলায় নাকি নিতান্ত দুর্ম্মতিবশতঃ ওই কাজটি ক'রে ফেলেছিলেন। তার পরে বোধোদয় হ'লে, একদিন শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে গিয়ে যেখানে যত "বীণ" ছিল, সব

একসঙ্গে ক'রে আগুন ধরিয়ে দিলেন। ওই একখানি কেমন ক'রে লুকিয়েছিল। ভাগ্যক্রমে আমি সেটি টেনে বার করলুম এবং বলাই বাহুল্য, অধিকার করলুম। সেই "বীণ" এখনও আমার কাছে রয়ে গেছে; তার ঝঙ্কার কাব্যরসিককে মোহিত করবে।

দিনেন্দ্রনাথের স্বরচিত গানগুলি সুরের অভিনব মাধুর্য্যে ও বৈচিত্র্যে বাংলা গানের ভাণ্ডারে এক অপরূপ দান। যে বিপুল প্রতিভা নিয়ে তিনি এসেছিলেন, যদি প্রকাশের অবসর দিতেন, তবে তাঁর সমতুল্য কবি ও সঙ্গীতরচয়িতা বাংলা দেশে বেশী থাকৃত না। কিন্তু তিনি তাঁর আশ্চর্য্য প্রতিভাকে লুকিয়ে রাখলেন সঙ্গীতচর্চ্চা ও স্বরলিপিলিখনের অন্তরালে। সারা জীবন দিয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সাধনা ক'রে গেলেন। আজ যে রবীন্দ্রনাথের গান বাংলা দেশে এবং বাংলার বাহিরেও এত অজস্র প্রচার হয়েছে, এর গৌরব দিনেন্দ্রনাথেরই,—আর কারও নয়। কবিগুরু ত গান লিখে শিখিয়ে ছেড়ে দেন; মনে ক'রে রাখা বা প্রচারের দায়িত্ব তাঁর নয়। এই গানের জন্য সমস্ত বাংলা দেশ দিনেন্দ্রনাথের কাছে ঋণী। সঙ্গীতভারতীর পূজাবেদীতে নিজেকে নিঃশেষে আহুতি দিয়ে গেলেন এই ভক্ত পূজারী।

আনন্দের উৎস ছিলেন তিনি, গানের ঝরণাতলায় খেলা ক'রে তাঁর দিন গেছে। তাঁর জীবনের সুরটি তাঁর এই একটি গানেই মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে—

"বলা যদি নাহি হয় শেষ
তাহে নাহি মোর দুঃখলেশ।
খেলেছি ধরার বুকে
এই স্মৃতি বহি' সুখে
ভাসাবো তরণী লখি' সেই অজানার দেশ।
সুর যদি নাহি পাই খুঁজি,
আমার বেদনা লহ বুঝি।
নয়ন ভরিয়া দেখি
ভাবি কি মধুর এ কী
নিয়ে যাবো প্রাণ ভরি তোমার সুরের রেশ।"

তিনি ছিলেন গানের রাজা। যে-দেশে গান কখনও থামে না, হাসি কখনও মলিন হয় না, সেই নিষ্কলঙ্ক স্বচ্ছ আনন্দের দেশে, মধুরতর গানের রাজ্যে তিনি চলে গেছেন। শোক করব না তাঁর জন্যে। তাঁর সেই সদানন্দ হাস্যময় দীপ্যমান মুখখানি আর কখনও দেখতে পাব না। তাঁর মধুর স্নেহময় কণ্ঠস্বর আর কখনও কানে বাজবে না, তাঁর কাছে ব'সে আর কখনও গান শিখব না, এ কথা ভাবলে মন অবসন্ন হ'য়ে পড়ে। কিন্তু যতখানি পেয়েছি, এই কি কম সৌভাগ্য? কেবলই দিয়েছেন, ঝরণার মত উচ্ছলিত আনন্দের বেগে কেবলই বিলিয়ে দিয়েছেন, কিছু বাকী রাখেন নি, বিনিময়ে কিছু ফিরে চান নি। এমন একটি আশ্চর্য্য মানুষের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলাম, সেই আনন্দের স্মৃতি পথের সম্বল হয়ে রইল।

দিনেন্দ্র-স্মৃতি*

তেজেশচন্দ্র সেন

পরলোকগত ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় কিরূপে ঘটে, আজ তা মনে করা আমার পক্ষে শক্ত। কারণ তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় ত্রিশ বৎসরের। আমার আশ্রমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে পরিচয় আরম্ভ হয়।

পরিচয় না হয়েও উপায় ছিল না। যাঁরাই আশ্রমে এসেছেন, তিনিই এসে প্রথম তাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে পরিচয় করতেন। সর্ব্বাগ্রে তিনিই হাসিমুখে তাদের সকলের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। তারপর সেই সামান্য মৌখিক পরিচয় আন্তরিক ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হ'তে বেশী দেরী হ'ত না। আমার বেশ মনে পড়ে, প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই আমার মনে হ'তে লাগলো তাঁর সঙ্গে আমার যেন কতকালের পরিচয়। এ শুধু আমারই সম্বন্ধে নয়; যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরাই জানেন তিনি কত সহজে সকলকে আপনার ক'রে নিতে পারতেন।

আমি যখন আশ্রমে প্রথম আসি, তখন আমি তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলাম,—মাথায় ছিলাম আরো বেশী ছোট। তাঁর বিপুল বিরাট দেহের পাশে আমাকে ক্ষুদ্রকায় একটি বামনের মত দেখাতো। আশ্রমের ছেলেমেয়েরা আমাদের পরস্পরের বন্ধুত্বের ও দেহের তুলনা ক'রে আমাদের প্রায়ই ঠাট্টাও করতো। তিনি সেই ঠাট্টায় যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করতেন, ও তাঁহার সহজ সরল হাসিতে চারিদিক কম্পিত ক'রে তুলতেন। তাঁর হাসি ছিল তাঁরই স্বর্গীয় পিতামহ শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের হাসিরই মত;—সে হাসি যেমন প্রাণ-খোলা, তেমনি গুরুগম্ভীর। কারণে অকারণে তাঁর মুখে হাসি লেগেই থাকতো। যাঁরা তাঁর হাসি একবার শুনেছেন, তাঁরা কখনো তা ভুলতে পারবেন না।

প্রথম পরিচয়ের পর আমি প্রথম প্রথম খুব ভয়ে ভয়েই তাঁর কাছে যেতাম। কিন্তু সে খুব অল্পদিনের জন্য। তারপর দেখতে দেখতে তিনি এতটা আপন হ'য়ে গেলেন যে, তাঁর সম্বন্ধে আমার সমস্ত ভয়তো কেটে গেলই, মনের মধ্যে সঙ্কোচও কিছুমাত্র রইল না। প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচ আমার পক্ষে কাটানো খুব সহজ ছিল না। এ সম্বন্ধে একটা হাসির কথা এখনো আমার বেশ মনে পড়ে। তখন আমি আশ্রমে প্রথম এসেছি। শিশু-বিভাগের ছোট ছেলেদের সঙ্গে থাকি। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন শিশুবিভাগের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক। আমার প্রতি দয়াপরবশ হ'য়েই তিনি বিকেলে বেড়াতে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেন। তিনি অনেক কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, কিন্তু আমার কাছ থেকে 'হাঁ' ও 'না' ভিন্ন আর কোন জবাব পেতেন না। বোধহয় সে কথা গুরুদেবের (আশ্রম-গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমরা আশ্রমের সকলেই গুরুদেব ব'লে সম্বোধন ক'রে থাকি) কানে গিয়েছিল। তিনি একদিন আমারই সামনে যতীন বাবুকে জিজ্ঞাসা

* বিশ্ব-ভারতীর ছেলেদের হাতের লেখা "বিশ্ব-ভারতী পত্রিকা" হইতে গৃহীত।

করলেন—"কিহে ওকে (আমাকে) দিয়ে কথা বলাতে পারলে ?" ৺দিনু বাবুর সম্বন্ধে আমার মনের এই সঙ্কোচ খুব বেশীদিন ছিল না ; সে শুধু তাঁরই গুণে। মানুষকে সহজেই আপন ক'রে নেবার শক্তি তাঁর অসাধারণ ছিল।

প্রথম পরিচয়ের পর তাঁর সম্বন্ধে একটা বিষয় আমার ভারি আশ্চর্য্য ব'লে মনে হতো। তিনি তখন থাকতেন নীচু বাংলায়। সেখান থেকে তিনি কখনো দুপুরে, কখনো বিকেলে আশ্রমের দিকে বেড়াতে আসতেন। যেমনি আশ্রমের শালশ্রেণীর নীচে তাঁ'র বিপুল, বিরাট দেহ দেখা দিত, অমনি আশ্রমের ছাত্র-শিক্ষক সকলেই খুশী হ'য়ে উঠতো। ছেলেরা ঘর থেকে বের হ'য়ে তাঁর সামনে ভিড় ক'রে দাঁড়াতো। শিক্ষক মহাশয়দের মধ্যেও অনেকে ঘর থেকে বের হয়ে আসতেন, কেউ কেউ ঘরে বসেই তাঁকে চীৎকার ক'রে ডাকতে থাকতেন। তখন শিক্ষক মহাশয়গণ কেউ তাঁকে ডাকতেন দিন্ সাহেব, কেউ ডাকতেন দিন্-দা, কেউ ডাকতেন দিনুবাবু ব'লে। পরে তিনি আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক ও বন্ধুমহলে দিন্-দা ব'লে পরিচিত ছিলেন। তিনি যে-ঘরে গিয়ে বসতেন, সে ঘরেই গল্পগুজব হাসিঠাট্টার মজলিস্ জমে উঠতো। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেতাম তাঁর প্রাণখোলা ঘন ঘন উচ্চ হাসির আনন্দলহরী। শুধু বড়দের সঙ্গে নয়, ছোটদের নিয়ে হাসিগল্পের আসর জমাতে তাঁর দোসর কেউ ছিল না। সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য্য মনে হতো, যখন তিনি শিশু-বিভাগের ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে গল্পের আসর জমিয়ে তুলতেন। তিনি বসতেন মহাদেবের মত ছেলেদের মাঝখানে একটা তক্তপোষের উপর। আর ছোটরা কেউ বসতো তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে, কেউ বসতো ঠিক তাঁর কোল ঘেঁসে। সে অবস্থায় তিনি যখন তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন, তখন তাঁকে শিশুবিভাগেরই একটি বৃহৎ শিশুর মতো মনে হতো। উঠতে চাইলেও তিনি তখন উঠতে পারতেন না। উঠবার উপক্রম করলেই চারদিক থেকে শিশুকণ্ঠের মিনতির সুর বেজে উঠতো—"দিন-দা, আর একটু বসুন।" আর 'দিন-দাও' অমনি ব'সে পড়তেন। আশ্রমের শিশুদের প্রতি তাঁর যে একটি অকৃত্রিম স্নেহভালবাসা ছিল, এমন স্নেহভালবাসা সচরাচর খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। ছোটবড় সকলকেই তিনি এমন হাসাতে ও আনন্দ দিতে পারতেন যে, তিনি যেখানে গিয়ে বসতেন সেখানেই হাসিআনন্দের ফোয়ারা যেন খুলে যেত।

সত্যি, ফোয়ারার মতই তাঁর ভিতর ছিল হাসি ও আনন্দের অফুরন্ত উৎস। সে উৎস শূন্য হ'তে কখনো দেখিনি। কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা,—রসসৃষ্টির সবদিকেই তাঁর অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তিনি নিজেও কবিতা লিখতেন খুব সুন্দর। নিজের রচিত গানও তাঁর অনেক ছিল। কিন্তু সে কবিতা ও গান দুচারজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্যতীত অন্যরা বড় একটা দেখতে বা শুনতে পেত না। নিজের গান ও কবিতা সম্বন্ধে তাঁর নিজের মধ্যে এমন একটি সঙ্কোচ ছিল যে, বন্ধু-মহল ব্যতীত সাধারণের নিকট কখনো তা প্রকাশ করতে চাইতেন না। গান ও কবিতা তিনি রচনা করতেন, বন্ধুদের পড়ে বা গেয়ে শুনাতেন, তারপরেই সব ছিঁড়ে ফেলতেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর স্বর্গীয় পিতামহ ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরই উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। তাঁর গান ও কবিতার ছিন্ন পত্র তাঁর বাড়ির চারিদিকে ছড়াছড়ি

যেত। একখানি মাত্র কবিতার বই তিনি ছাপিয়েছিলেন। কিন্তু শেষে এই জন্য তাঁর মনে অনুশোচনার অন্ত ছিল না। সেই বই একখানাও তিনি কোন বইয়ের দোকানে বিক্রয়ের জন্য দেন নি। অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই বইয়ের গাদা তাঁর ঘরেই বস্তাবন্দী হ'য়ে পড়েছিল। তারপর, আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি নিজের হাতেই অগ্নিসংযোগে তা নষ্ট ক'রে ফেলেন। বন্ধুদের নিকট দু'একখানা ব্যতীত সেই বইয়ের চিহ্ন আজ বাংলাদেশ হ'তে লোপ পেয়ে গেছে।

যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁদেরই আমরা কবি ব'লে থাকি। কিন্তু যথার্থ কবি ও কবিতালেখকের মধ্যে অনেক তফাৎ। কবি না হ'য়েও অনেকে ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে রাশি রাশি কবিতা লেখেন ও বিচিত্র মলাটের আবরণে সজ্জিত ক'রে ছাপিয়ে কবি-যশপ্রাপ্তির চেষ্টা করে থাকেন। দিনেন্দ্রনাথের মধ্যে যশ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা,—বিশেষভাবে কবিযশ—কোনদিনই ছিল না। অথচ তাঁর মত এমন কাব্য-রসিক আমাদের আশ্রমে খুব কমই ছিল। আমি যখন আশ্রমে প্রথম আসি, তখন এখানে ইংরেজ কবি শেলি, কীট্স্ ও ব্রাউনিঙের খুব রেওয়াজ। গুরুদেব তখন আমাদের ব্রাউনিং প'ড়ে শুনাতেন। ৺দিনুবাবুর মুখে আমরা শুনতুম শেলি ও কাট্স্। যাঁরা তাঁর মুখ থেকে কবিতা-পাঠ শুনেছেন, তাঁরাই জানেন তিনি কী সুন্দর ক'রেই না কবিতা পড়তেন। গুরুদেবের কবিতার তো কথাই নেই। তিনি একবার গুরুদেবের কবিতা পড়তে আরম্ভ করলে আর যেন থামতে চাইতেন না; একটার পর একটা পড়েই যেতেন। গুরুদেবের অসংখ্য কবিতা তাঁর একেবারে মুখস্থ ছিল। আশ্রমের মধ্যে তাঁর 'বেণুকুঞ্জ' ঘরটি ছিল মজলিসের ঘর। সেখানে গানের মজলিস্, কাব্যপাঠের মজলিস্, হাসিগল্প ও ভোজের মজলিস্ প্রায় লেগেই থাকতো। সে সময় যাঁরা সেই মজলিসে যোগ দিতেন, তাঁদের অনেকেই আজ আর আশ্রমে নেই। কিন্তু তাঁদের মনে সেই স্মৃতি নিশ্চয়ই আজও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে এবং চিরকাল উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে। তাঁরা যখন আশ্রমে আসেন, তখন দেখতে পাই ৺দিনুবাবুর অভাব তাঁরা আশ্রমের মধ্যে সব চেয়ে বেশী অনুভব করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্য-কাব্য 'ফাল্গুনীর' উৎসর্গপত্রে লিখেছেন—"আমার সকল গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে এই নাট্য-কাব্যটি কবি-বাউলের একতারার মত সমর্পণ করিলাম।" সত্যি সত্যি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এত বড় ভাণ্ডারী বাংলাদেশে আর একজনও নেই। গুরুদেবের সব গান একত্র করলে কত হবে ঠিক বলতে পারব না, হাজারের উপর তো নিশ্চয়ই হবে। ৺দিনুবাবু সেই গান সবতো জানতেনই, তাছাড়া গ্রাম্যসঙ্গীত, বাউল, কীর্ত্তন, নানাবিধ ইংরেজী ও হাসির গানেরও তিনি একজন বড় ভাণ্ডারী ছিলেন। ডি, এল, রায়ের হাসির গান গেয়েও তিনি আমাদের কম হাসাতেন না। তাঁর মুখে শুনেছি, ডি, এল, রায় নিজেই তাঁকে তাঁর সব হাসির গান শিখিয়েছিলেন।

অনেকের বিশ্বাস গুরুদেবের নূতন গানে ৺দিনুবাবু সুর দিতেন। কিন্তু তা ঠিক না হ'লেও, গুরুদেবের গান টাট্কা টাট্কা শিখে সঠিক মনে রাখা সহজ নয়। কারণ গুরুদেব যখন গান তৈরী করতে আরম্ভ করেন, তখন দিনে একটি দুটি নয়,—এক এক সময় একসঙ্গে আটটি দশটি গানও তিনি

তৈরী করেছেন। সে সুরও একরকমের সুর নয়—কোনটা হয় তো সকালের সুর, কোনটা রাত্রির, কোনটা হয়তো সন্ধ্যেবেলার। এইরকম বিভিন্ন সময়ের সুর একসঙ্গে শিখে নিয়ে মনে রাখা যে কত শক্ত, সঙ্গীত-শিক্ষার্থী মাত্রই তা অবগত আছেন। ৺দিনেন্দ্রনাথকে সেই অসাধ্যসাধন করতে হতো; কারণ গুরুদেব নূতন গানে সুর দিয়ে দিনুবাবুকে না শিখিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতেন না। গুরুদেব নিত্যি নূতন নূতন সুর সৃষ্টি করলেও, নিজের গানের সুর ভুলে যাবার ক্ষমতাও তাঁর অসাধারণ। সেই জন্য গানে সুর দিয়েই তিনি ৺দিনুবাবুকে ডেকে পাঠাতেন;—কখনো কখনো তিনি নিজেই গানের খাতা হাতে ক'রে, গানের সুর গুন্‌গুন্ করতে করতে ৺দিনুবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হতেন। তারপরেই শেখবার ও শেখাবার পালা আরম্ভ হ'তো। সে সময় আমরাও সময় সময় উপস্থিত থাকতাম। দিনুবাবুর বাড়িতে সে সময়গুলির কথা কোন দিন ভুলতে পারবনা। সে সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই থাকতেন আনন্দে ভরপুর। উভয়েরই পা গানের তালে তালে উঠছে পড়ছে, হাতে তুড়ি বাজছে, গানের সুর আবৃত্তির পর আবৃত্তি হচ্ছে, উভয়েরই মুখ উজ্জ্বল, চোখে আনন্দের দীপ্তি। আমরা মুগ্ধ হ'য়ে শুনছি, একএকবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছি। গান শেষ হ'য়ে যেত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখনো বসে থাকতেন—গানের কথা উঠতো, সুরের কথা উঠতো। কখনো তিনি এক একটি সুরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করতেন; স্নানের সময়, খাবারের সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যেত, যখন ঘরে ফিরতাম মন ভরে থাকতো। তখন বিশ্ব-ভারতীর পত্তন হয়নি, তখন ছিল আশ্রমের সহজ সরল জীবনযাত্রার যুগ। তখন লোকসংখ্যা ছিল অল্প। আশ্রমবাসীরা তখন সকলে এক পরিবারের পরম আত্মীয়ের ন্যায় বাস করতাম।

কি দ্রুতই না তিনি গান শিখতেন আর কি নির্ভুলই না তিনি শিখতেন ও শেখাতেন। গানের সুর নির্ভুল মনে রাখবার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ ছিল। পূর্ব্বেই বলেছি গান শেখাবার সময় আমরা তাঁর ঘরে মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতাম। ছুটির দিনে গুরুদেবকে গানের খাতা হাতে ক'রে ৺দিনুবাবুর বাড়ির দিকে যেতে দেখলেই, আমরা সব গিয়ে সেখানে জুটতাম। গান শেখবার লোভে অনেক সময় ক্লাশ কামাই করেও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি, ও পরে গুরুদেবের কাছ থেকে সস্নেহ তিরস্কারও খেয়েছি। সকলেই জানেন, গুরুদেবের নূতন গান টাট্‌কা টাট্‌কা শিখে মনে রাখা কত শক্ত। আমরা গান শিখে নিয়ে গানের কাগজটা পকেটেই রেখে দিতাম। এবং যখনতখন কাগজটা বের করে গানের সুরটা মনে রাখবার চেষ্টা করতাম। ৺দিনুবাবুকে কখনো একবার শিখে নেবার পর গানের সুর মনে রাখবার জন্য বারবার চেষ্টা করতে দেখিনি। সুরটা মনে আছে কি না জিজ্ঞাসা করলেই বলতেন "কাল ভোরে ঠিক মনে আসবে।" হতোও তাই। আমি সকালেই ঘুম থেকে উঠে ৺দিনুবাবুর চায়ের টেবিলে গিয়ে হাজির হতাম। খুব ভোরেই তাঁর চা খাওয়া অভ্যাস ছিল। আর চা খেতেন বাইরে, একেবারে খোলা আকাশের নীচে বসে। এ বিষয়ে দাদা (গুরুদেব) ও নাতির (দিনুবাবুর) অভ্যাস একরকমই ছিল। গিয়ে দেখতাম তিনি চায়ের টেবিলে বসে আছেন। আমি বসেই পকেট থেকে গানের কাগজটা বের করতাম, ভয়ে ভয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাতাম। তিনি

বুঝতে পারতেন গানটা আমি ভুলে গেছি। একটু হেসে বলতেন—"কি, ভুলে গেছ?" এই বলে গুরুদেবের হাতের লেখা গানের কাগজ পকেট থেকে বের করতেন। কিছুক্ষণের জন্য সেদিকে তাকিয়ে থাকতেন। তারপরেই দেখতে পেতাম ডান হাতের আঙ্গুলে তালে তালে তুড়ি পড়তে আরম্ভ হয়েছে, মুখে গুন্‌গুন্ ধ্বনি। সে শুধু কয়েক মিনিটের জন্য। তারপরেই আগাগোড়া গানটা একটানা নির্ভুল গেয়ে যেতেন। গলায় সুর একটুও বাধ্‌ত না। নূতন গান নির্ভুল শিখলেও গলায় ঠিকমত বসতে সকলেরই একটু সময় লাগে। কিন্তু ৺দিনুবাবুর ক্ষমতা ছিল অদ্ভুতরকমের। পরদিন সকালেই আবার গুরুদেবের নিকট ৺দিনুবাবুর ডাক পড়তো—নূতন গান শিখবার জন্যও বটে, পূর্ব্বদিনের গানের পরীক্ষা দেবার জন্যও বটে। গুরুদেব সম্পূর্ণই সুরটা ভুলে যেতেন—কিন্তু ৺দিনুবাবু কাগজ হাতে নিয়ে কী নির্ভুল, আর কী দরদ দিয়েই না গানটা গেয়ে যেতন। মনে হ'ত গানটা তিনি যেন কতদিন ধ'রেই না শিখেছেন, ও কতদিন ধ'রেই না গেয়েছেন।

গান সম্বন্ধে ৺দিনুবাবুর শুধু ক্ষমতা নয়, এমন রসবোধও খুব অল্প লোকের মধ্যে দেখা যায়। গুরুদেবের গান এমন রস দিয়ে, এমন দরদ দিয়ে খুব অল্প লোককেই গাইতে শুনেছি। পূর্ব্বে আশ্রম যখন ছোট ছিল, বিশ্বভারতী এতটা বিস্তৃতি লাভ করেনি, তখন এখানকার উৎসবে, পূজার ছুটির পূর্ব্বে অভিনয়ে কলকাতা থেকে আশ্রমবন্ধুরা এখানে প্রায়ই আসতেন। এমন খুব অল্প উৎসব ও অভিনয়ই বাদ পড়েছে, যখন কবি সত্যেন্দ্রনাথ ও সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আশ্রমে না এসেছেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন ৺দিনুবাবুর অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁরা যে কয়দিন আশ্রমে থাকতেন, সে কয়দিন দিনুবাবুর ঘরে কী গানের মজলিসই জমে থাকতো';—গল্পের, হাসিঠাট্টার তো কথাই নেই।

শেষের দিকে তিনি নিজে বড় একটা গান গাইতে চাইতেন না। কিন্তু কেউ তাঁর কাছে গান শিখতে চাইলে, তিনি কাউকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। অপরিচিত, অজানা লোককে গান শেখাবার সঙ্কোচ কাটানো খুবই শক্ত। দেখতাম তেমন লোকও তাঁর নিকট কত গান শিখতে আসতো। কেউ আসতো গ্রামোফোনের রেকর্ডে গান দেবার জন্য গুরুদেবের গান শিখতে, কেউ আসতো রেডিয়োতে গান দেবার জন্য গান শিখতে। আশ্রমের ছেলে, মেয়ে, শিক্ষক মহাশয়দের তো কথাই ছিল না। যখন তখন তাঁর কাছে গিয়ে গান শেখবার জন্য আমরা উপদ্রব করেছি। সে উপদ্রব তিনি হাসিমুখেই নিতেন। তাঁর কাছে আমরা গানও শিখতাম, সঙ্গে সঙ্গে পেট ভ'রে খেয়েও আসতাম।

আমি যখন প্রথম আশ্রমে আসি, তখন গানের হাওয়ায় সমস্ত আশ্রম ভরপুর থাকতো। তখন পূজনীয় ৺অজিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় জীবিত ছিলেন। তিনি নিজেও ভালো গান গাইতে পারতেন, গানে তাঁর অসাধারণ অনুরাগও ছিল। ৺দিনুবাবুর ঘরে তখন গানের মজলিস জমেই থাকতো। বর্ষার দিনে তো কথাই ছিল না। বর্ষার দিনে আকাশে একটু মেঘের আভাস দেখা দিলেই আমরা তাঁর বেণুকুঞ্জের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হতাম। বৃষ্টি নামলে স্কুলের ক্লাশও ছুটি হয়ে যেতো; ছেলেরাও তখন সকলে ছুটে গিয়ে উপস্থিত হ'ত বেণুকুঞ্জে। তারা জানতো এমন দিনে ৺দিনুবাবুর ঘরে গানের মজলিস নিশ্চয়ই জমবে। তারা

সকলে মিলে চারদিকের বারান্দা ঘিরে বসতো। জানালার ভিতর তাদের সকৌতুক দৃষ্টিপূর্ণ, উৎসাহদীপ্ত মুখ আমরা দেখতে পেতাম। আমরা নীচে ফরাসে বসতাম—কেউ তাঁর বৃহৎ খাটের উপর গিয়ে বসতো। ৺দিনুবাবু শুধু গলায়ই গান গাইতেন;—মাঝে মাঝে তাঁর হাতে এস্রাজ থাকতো। এমন এস্রাজের হাত ও খুব অল্প লোকেরই হয়ে থাকে। আমাদের আশ্রমে মাঝে মাঝে বড় বড় এস্রাজীও এসেছেন। তাঁরা তাঁদের হাতের কৌশল ও কস্‌রতে আমাদের তাক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ৺দিনুবাবুর এস্রাজের হাতের মত এমন মিষ্টি হাত একজনেরও শুনিনি।) গান আরম্ভ হতো, ফরমাসের পর ফরমাস চলছে। তিনিও একটার পর একটা গেয়ে যাচ্ছেন। আপত্তি নেই, শ্রান্তি নেই। বাইরে বৃষ্টি থেমে যেতো, কিন্তু সেদিকে আমাদের কারোরই খেয়াল থাকতো না। খাবারের ঘণ্টায় আমাদের চৈতন্য হতো। ছেলেরা আস্তে আস্তে উঠে পড়তো, কিন্তু নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে। এমন একদিন নয়, দুদিন নয়, বর্ষায় দিনের পর দিন এরকমের মজলিস তাঁর ঘরে প্রায় লেগেই থাকতো। মাঝে মাঝে গুরুদেবও ছাতামাথায় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গানের খাতা হাতে বেণুকুঞ্জে এসে উপস্থিত হ'তেন। তাঁর হাতে গানের খাতা দেখতে পেলেই বুঝতে পারতাম নূতন গান হয়েছে। তখন সকলের মন কী আনন্দেই না ভ'রে উঠতো। তখন গান ছিল সমস্ত আশ্রমের প্রাণ। নূতন নূতন গান তৈরী হতো, ৺দিনুবাবু সে সব শিখে নিতেন, তাঁর মুখ থেকে ছেলেদের মধ্যে সে-সব গান ছড়িয়ে পড়তো। তারপর দিনরাত্রই তাদের মুখে সে-সব গান শুনতে পেতাম।

যেদিন চারিদিক অন্ধকার ক'রে মুষলধারে বৃষ্টি নামতো, সেদিন আমরা আর ঘরে বসে থাকতে পারতাম না। দল বেঁধে বৃষ্টিতে ভিজতে বের হ'য়ে পড়তাম। অনেকে হয় তো মনে করবেন—এ আবার কিরকমের কবিত্ব! বৃষ্টিতে ভেজা?—এ যে একটু বেশী বাড়াবাড়ি। কিন্তু তাঁরা জানেন না এখানকার বর্ষা যে কী জিনিষ। চারদিকের খোলামাঠের বর্ষা যে মোটেই কলকাতার সহুরে বর্ষা নয়, তা না দেখলে বোঝা শক্ত। এখানকার বর্ষা সকলকে যেন হাত বাড়িয়ে ডাকতে থাকে 'চল, ভিজতে চল।' আমাদের সে ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় ছিলনা। হুড়মুড় ক'রে, ছেলে শিক্ষক সকলে মিলে বের হয়ে পড়তাম। যে ঘরে বসে থাকতো, তাকেও টেনে বের ক'রে নিতাম। ৺দিনুবাবুকেও আমরা ছাড়তাম না। প্রথম তিনি মুখে একটু আপত্তি করতেন; কিন্তু সে আপত্তি কে শোনে? তাঁকে সঙ্গে ক'রে না নিলে কি আর মজা হয়? বিশেষতঃ বৃষ্টিতে ভেজবার মত মজা! ছেলেরা কেউ ধরতো তাঁর হাতে, কেউ ধ'রতো তাঁর কোমরে। তখন হৈ হৈ ক'রে তাদের থামিয়ে তিনি বৃষ্টিতে নেমে পড়তেন। তারপর সে কি উৎসাহ! মাঠে পড়েই গান আরম্ভ হতো "বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে"। আমাদের দলে অ-সুরের দলও অনেক থাকতো। ৺দিনুবাবু তাদের প্রাণপণে থামাতে চেষ্টা করতেন। গানের মধ্যে বেসুর তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু সে উৎসাহের মধ্যে সুর-বেসুরের জ্ঞান কি আমাদের আর থাকতো? শুধু গানই নয়—তালে বেতালে ধেই ধেই ক'রে নাচও সুরু হত। মাঠের জলও এঁকেবেঁকে নাচতে নাচতে খোয়াইয়ের দিকে ছুটে চলেছে, আমরাও নাচতে নাচতে সেই জলের ধারার সঙ্গে সঙ্গে খোয়াইয়ে নেমে পড়তাম।

সেখানে জলের স্রোত উদ্দাম উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছে। আমাদের সঙ্গে ৺দিনুবাবুও সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতেন। তাঁর সেই বিপুল বিরাট দেহ যখন স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলতো, তা দেখে আমাদের আনন্দের অন্ত থাকতো না। সমস্ত সকালটা এইরূপে হৈ হৈ ক'রে যখন আশ্রমে ফিরতাম, তখন আমরা সকলেই অত্যন্ত শ্রান্তক্লান্ত হ'য়ে পড়তাম। ৺দিনুবাবু শ্রান্তক্লান্ত হ'লেও ফিরবার সময় আমাদের নানারকমের গল্প ব'লে খুব হাসাতেন। এখন আশ্রমের সে-সব দিনের কথা স্বপ্নের মত মনে আসে।

এ সবই পুরাণো কথা। যাঁরা এখন এখানে নূতন এসেছেন, তাঁরা ৺দিনুবাবুকে দেখলেও তাঁর পূর্ব্বের রূপ অনেকেই দেখতে পাননি। শেষের দিকে তিনি বাড়ি হ'তে বড় একটা বের হ'তেন না, বের হলেও মোটরে করেই প্রায় বের হতেন। কিন্তু এক সময় ছিল যখন আশ্রমের এমন কোন অনুষ্ঠান ছিলনা, যা তাঁকে বাদ দিয়ে হ'তে পারতো। (আশ্রমের সকলরকমের উৎসবে, তা বর্ষামঙ্গলেই হ'ক, শারদোৎসবেই হ'ক, ছুটির পূর্ব্বে অভিনয়েই হ'ক, বা ছেলেদের আনন্দবাজারের মেলাতেই হ'ক ;—তিনি ছিলেন সকল উৎসবের মূর্ত্তিমান আনন্দ। ছেলেদের আনন্দবাজারে আসবার সময় তাঁর পকেট নোটে, টাকায়, সিকি আধুলি, দুয়ানিতে ভর্ত্তি থাকতো। সন্ধ্যের পর যখন বাড়ি ফিরতেন, তখন দেখতে পেতাম পকেট একেবারে শূন্য হ'য়ে গেছে। কমপক্ষেও সেদিন তাঁর দশপনেরো টাকার কম খরচ হত না। সেদিনের আশ্রমের ছেলেমেয়েরা, বিশেষভাবে ছোটরা, তাঁর টাকায় আনন্দবাজারের মিষ্টির ভাণ্ডার লুঠ করতো।) আমরাও সে আনন্দ থেকে বাদ পড়তাম না। চায়ের দোকান থেকে ঘন ঘন তাঁর ডাক পড়তে থাকতো। কারণ তারা জানতো একবার ৺দিনুবাবুকে দোকানে বসাতে পারলে তাদের বিক্রীর জন্য আর ভাবতে হবে না। তাই সন্ধ্যের সময় যার দোকানে খাবার জিনিষ উদ্বৃত্ত থাকতো, ৺দিনুবাবুকে একবার ধরে এনে বসাতে পারলে নিমেষের মধ্যে তা নিঃশেষ হ'য়ে যেতো। ৭ই পৌষের মেলাতেও শূন্য পকেটে সন্ধ্যের সময় তাঁকে ঘরে ফিরতে হতো। ছেলেরা ও মেয়েরা এসে একবার বললেই হতো "দিনুদা, খাওয়াবেন না ?" অমনি ভোলা বা কালোর দোকানে ফরমাস হ'য়ে যেত। ছেলেমেয়েরা যদি সঙ্কোচ ক'রে অল্প খেতো (অবশ্য সকলে নয়), তাহলে তিনি তাদের ধমকিয়ে, তাড়া দিয়ে নিজের হাতে নানারকমের খাবার তাদের প্লেটে তুলে দিতেন।

(৺দিনুবাবুকে না হ'লে আমাদের পিকনিক্‌ও জমতোনা। পিকনিকের নামে তাঁর উৎসাহও ছিল অসম্ভবরকমের। ছেলেদের পিকনিক, মেয়েদের পিকনিক্, শিক্ষক মহাশয়দের পিকনিক, ছোটবড় সকল পিকনিকেই তাঁর ডাক পড়তো। শেষের দিকে সে-সকল পিকনিকে তিনি হেঁটে যেতে পারতেন না, কিন্তু যে-সকল জায়গায় মোটর চলত না, সে-সকল জায়গায় তিনি গোযানে চড়ে যেতেন। তখন আশ্রমে পিকনিক্‌ও হতো খুব ঘন ঘন। একদিনের পিকনিকের কথা এখনো আমার মনে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। তখন ফাল্গুন মাস, সেদিন রাত্রিতে ছিল পূর্ণিমা। স্থির হ'ল রাত্রিতে পিকনিক্ হবে। সেই প্রস্তাবে আশ্রমের মেয়েরাও অনেকে খুব উৎসাহী হ'য়ে উঠলেন। খাওয়ার ব্যবস্থার ভার তাঁরাই গ্রহণ করলেন। সুতরাং তা যে বেশ পরিপাটিরকমের হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। কথা

হ'ল খেয়ে দেয়ে, একটু বেশী রাত হ'লে আবার আশ্রমে ফিরে আসব। তাই বেশী দূরে না গিয়ে, আশ্রমের পশ্চিমদিকের সাঁওতালপাড়ার গ্রামে পিকনিকের জায়গা স্থির করা হ'ল। সন্ধ্যার পর দল বেঁধে সেদিকে চল্‌লাম। বলা বাহুল্য ৺দিনুবাবুও আমাদের দলে ছিলেন। গরুর গাড়িতে চল্‌লো খাবার জিনিষ; আমরা চল্‌লাম হেঁটে হেঁটে। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই পূবদিকে রেল লাইনের উঁচু পাড়ের উপর পূর্ণিমা রাত্রির পরিপূর্ণ চন্দ্র দেখা দিল। দেখতে দেখতে পশ্চিমদিকের দিগন্তপ্রসারিত মাঠ চাঁদের আলোতে ভরে গেল। সে খোলা মাঠ একেবারে ফাঁকা, একটি গাছ বা বাড়ির চিহ্নও তাতে নেই। দূরে দূরে কোথাও তালগাছের সারি বা সাঁওতালদের ঘর কালো ঝাপসা হয়ে গেছে। একটি জায়গা বেছে নিয়ে সেই খোলা মাঠের মধ্যে, মুক্ত আকাশের নীচে, চাঁদের উজ্জ্বল আলোতে আমরা সকলে গিয়ে বসলাম। কী সুন্দর রাত্রি! কিছুদূরে দক্ষিণের শালবন ফুলে একেবারে ভরে গেছে, তারি গন্ধে মাঠের হাওয়া ভরপুর। সে রাত্রিতে কারোরই আশ্রমে ফিরতে ইচ্ছে হলনা। লোক পাঠিয়ে কম্বল, সতরঞ্চি প্রভৃতি আনিয়ে, সেইখানেই ঘুমোবার বন্দোবস্ত করা হল। কিন্তু সে রাত্রিতে কে ঘুমোয়? একে মধুমাস ফাল্গুন, তাতে পরিপূর্ণ পূর্ণিমারাত্রি, তার উপর ৺দিনুবাবুর এস্রাজ ও গান। সেদিন ৺দিনুবাবুর দিল্‌ও একেবারে খুলে গেল। "আমার প্রাণের পরে চলে গেল" থেকে আরম্ভ ক'রে বিবিধ সঙ্গীতের প্রায় সব বাছাবাছা গানই তিনি একটির পর একটি গাইলেন। তারপর আরম্ভ হ'ল মায়ার খেলার গান। সেও একটি দুটি নয়, প্রায় গোটা মায়ার খেলার গানই তিনি সেদিন গাইলেন। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি আপত্তিও নেই। একটার পর একটা ফরমাস চলছে, তিনি গেয়ে চলেছেন। আমাদের কারোর মুখে কথা নেই, চারিদিক নীরব, নিঝুম। ৺দিনুবাবুর গলার সুর সেই নীরব নিস্তব্ধ মাঠে যেন ভেসে বেড়াতে লাগলো। যখন গান থামলো, তখন পূর্ণিমার চাঁদ মাথার উপর থেকে পশ্চিমে অনেকটা হেলে পড়েছে। ৺দিনুবাবু ক্লান্ত হ'য়ে শুয়ে পড়লেন। এমন একদিন নয়, ৺দিনুবাবুর ঘরেও এক একদিন গানে গানে এমনি সমস্ত রাত কেটে গেছে। দোলের দিন ভোরে তিনি সকলের আগে দুই পকেটে আবীর ভরে বাড়ি হ'তে বের হ'তেন। কিন্তু ঘর থেকে বের হ'তে না হ'তেই চারিদিক থেকে তাঁর উপর আবীর বৃষ্টি হ'তে থাকতো। ছোটবড় সকলেই অপেক্ষা ক'রে থাকতো কে সকলের আগে তাঁর মাথায় আবীর মাখাতে পারবে। কিন্তু ছোটদের তো দূরের কথা, আমাদের মত বড়দেরও তাঁর মাথায় আবীর মাখানো সহজ ছিলনা, কারণ তিনি লম্বায় ছিলেন প্রায় ছয় ফুট। তিনি ঘাড় নীচু ক'রে দাঁড়াতেন, আর ছোটরা মহা উল্লাসে তাঁর মাথায় আবীর মাখাতে থাকতো। তখন মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত আবীর ভিন্ন তাঁর শরীরে আর কিছুই দেখা যেতনা, তারপর আরম্ভ হ'ত তাঁর ঘরে বসে গান; গান যখন খুব জমে উঠতো, তখন দরজা বন্ধ করে সুরু হত নাচ। তিনি নিজেও সেই নাচে যোগ দিতেন। সবরকমের আমোদআহ্লাদের মধ্যেই শিশুর মত নিজেকে ছেড়ে দেবার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

তাঁর সম্বন্ধে আর একটি কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। তাঁর ঘরে যে শুধু গান হাসি, গল্প, ঠাট্টার মজলিসই বসতো তা নয়, ভোজনের মজলিসও তাঁর ঘরে প্রায় লেগেই থাকতো। তিনি

নিজে যেমন খেতে ভালোবাসতেন, তেমনি অন্যকে খাওয়াতেও ভালবাসতেন। তাঁর বাড়িতে শিক্ষক মহাশয় বা ছেলেমেয়েদের মধ্যে কারোর না কারোর নিমন্ত্রণ প্রায় লেগেই থাকতো। সবচেয়ে তিনি ভালবাসতেন ছোটদের খাওয়াতে। আশ্রমের শিশু-বিভাগের ছোট ছেলেদের দেখে তিনি প্রায়ই বলতেন —'বেচারারা বাড়ি থেকে মা-বাপ ছেড়ে এখানে এসেছে। তাদের আদর ক'রে খাওয়াবার কেউ নেই। তাই ওদের মাঝে মাঝে খাওয়াতে ইচ্ছা করে।" সেই "মাঝে মাঝে" বেশ একটু ঘন ঘনই হতো। যেদিন খাওয়াতেন, সকালেই তাদের জিজ্ঞাসা করতেন—"কি খেতে তোদের ইচ্ছে করে, বল্।" অমনি সকলে সমস্বরে বলে উঠতো—"দিনদা, লুচিপাঁঠা।" অমনি লুচিপাঁঠার ফরমাস হ'য়ে যেত। বিকেলে ছেলেরা লাইন ক'রে তাঁর ঘরের বারান্দায় বসতো—তিনি একটা চৌকি নিয়ে তাদের সামনে বসতেন। চুপচাপ বসে তিনি তাদের খেতে দিতেন না ;—নানারকম কথা বলে ঠাট্টা ক'রে তাদের হাসিয়ে আহারের জায়গা জমিয়ে রাখতেন। সে সময় তাদের পরিবেশন করতেন তাঁর স্ত্রী কমলা দেবী নিজের হাতে। তাদের খাওয়াবার সময় চাকরচাকরাণীদের দিয়ে তাঁরা দুজনেই বিশ্বাস করতে পারতেন না। কি জানি যদি যত্নের অভাব হয়, ঠিকমত সব জিনিষ সকলে না পায়! কী তৃপ্তি, কী আনন্দের সঙ্গেই না স্বামী স্ত্রী দুজনেই ছেলেদের খাওয়াতেন! বাড়িতে কোন একটা ভালো বা নূতন রকমের রান্না হলে অন্য কাউকে খাওয়াতে না পারলে কিছুতেই তাঁর তৃপ্তি ছিল না। অনেক সময় দেখেছি নিজেই তিনি মোটরে ক'রে বের হতেন লোক ডাকতে। কারণে অকারণে তাঁর বাড়িতে আমাদের ভোজ ও পিকনিক প্রায় লেগেই থাকতো। লোকদের খাইয়ে তৃপ্তি পাওয়া খোলা, উদার প্রকৃতির লোকের লক্ষণ। তাঁর হৃদয় ছিল উদার, প্রাণ ছিল খোলা, মন ছিল সরস। সঙ্গীত, কাব্যরচনা, নাট্যকলা ও ভাষা শিক্ষায় তার শক্তি ছিল অসাধারণ। এ সব বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও আসক্তি মোটেই ছিলনা। তাঁর মনের ভাব ছিল অনেকটা "এমনি ক'রে যায় যদি দিন যাক্না" গোছের। শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবেই দিন কাটিয়ে গেছেন। না ছিল তাঁর সাংসারিক বিষয়ে আসক্তি, না ছিল তাঁর মান, যশ, খ্যাতিপ্রতিপত্তির প্রতি লোভ। তিনি শিশুদের যেমন ভালোবাসতেন, তেমনি শিশুদের মতই তাঁর মন ছিল নিরাসক্ত ও সরস।

দিনেন্দ্রনাথ*

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

পরলোকগত ব্যক্তিদের স্মৃতিসভায় যোগদান করার আনুষ্ঠানিক সামাজিক রীতি পালন করেছি আমরা সকলেই একাধিকবার ; কিন্তু আজকার এই স্মৃতিসভা লৌকিকতার দায়মোচনরূপে একটি শুষ্ক কর্ত্তব্য সম্পাদনমাত্রই যে নয়, এ কথা সমবেত সকলেই মনেপ্রাণে অনুভব করছেন। পরমাত্মীয় বিয়োগের যে মর্ম্মবেদনা, তাই আজ ব্যথিত করে তুলেছে এই সম্মিলিত স্তব্ধ জনসঙ্ঘকে।

মনে হয়, দিনেন্দ্রনাথের জীবনের মর্ম্মকথা এইখানেই লুক্কায়িত আছে। ভারতের মধ্যযুগের একজন কবি তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় বলিয়াছেন—তুমি এই পৃথিবীতে এসেছিলে কেঁদে কেঁদে, চিরবিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় হাসিমুখে চলে যাও, সমগ্র পৃথিবীকে কাঁদিয়ে দিয়ে। স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ তাঁর বিচিত্র জীবন ও গৌরবময় মৃত্যুর ভিতর দিয়ে কবির সেই বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে সার্থক করে গেছেন। তিনি মানুষকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন, এবং প্রতিদানে পেয়েছিলেন অসংখ্য হৃদয়ের কোণে স্থান। তাই তাঁর মৃত্যু অনেকের কাছেই ব্যক্তিগত শোকের কারণ ; এবং আজ তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে স্বভাবতই তাঁর খ্যাতিপ্রতিপত্তি ও কীর্ত্তিকলাপকে ছাপিয়ে, তার অন্তরালে মহাপ্রাণ মানুষটির কথাই প্রথমে মনে পড়ে।

দিনেন্দ্রনাথের চরিত্র ছিল কঠিন ও কোমলের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। তাঁর সেই দুর্লভ পুরুষত্ব-ব্যঞ্জক দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ এখনো যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে। গুরুগম্ভীর সিংহনাদের মত বজ্রকণ্ঠ, কিন্তু তা'তে আবার কি কোমল লালিত্য ছিল ওতঃপ্রোত হয়ে। হীনতা, দুর্ব্বলতা এবং নীচাশয়তাকে তিনি প্রবলভাবে ঘৃণা করতেন ; তাঁর চিন্তায়, কার্য্যে এবং অনুভূতিতে একটা সতেজ পৌরুষ ছিল সদাজাগ্রত। কিন্তু এই দৃঢ়, কঠিন চরিত্রাবরণ যে একটী স্নেহকোমল হৃদয়কে লুক্কায়িত করে রেখেছিল, যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছে তারাই তার মধুর পরিচয় পেয়েছে। এই ভালবাসার পরিচয়সূত্রে তিনি অনায়াসেই হয়ে উঠেছিলেন বয়ঃকনিষ্ঠদের সকলেরই 'দিন-দা'।

মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম সহজ মমত্ববোধ ছিল বলে' বাঙ্গালীচরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল। তিনি ছিলেন মজলিসের লোক, যাকে ঘিরে অতি সহজেই একটি আনন্দের মধুচক্র গড়ে উঠত। ছোটবড় নানা বয়সের লোকজনকে চারপাশে জড়ো করে মজলিস বসিয়ে গল্প জমাতে তিনি কি ভালবাসতেন, তা সকলেই জানেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষ সপ্তকের' একটী কবিতাতে এই গল্পজমানোর সম্বন্ধে বলেছেন—

"একে নাম দিতে পারি সাহিত্য,
সব-কিছুর কাছে-থাকা।"

---

* রামমোহন রায় হলে পঠিত।

দিনেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহজে মানুষের মনের অত্যন্ত কাছে গিয়ে তাকে স্পর্শ করতে পারতেন। মানুষের প্রতি গভীর দরদ না থাকলে, এই গল্পবলার সত্যিকার রস সৃষ্টি করা যায় না। এই শক্তি বর্ত্তমান যন্ত্র-সভ্যতার যুগে একান্তই দুর্লভ। জীবনযাত্রা এমন কঠিন, স্বার্থে স্বার্থে বিপুল সংঘাত, সংশয় তর্ক আর নানা সমস্যা নিয়ে অহোরাত্র আমরা ক্লান্ত, অবসন্ন। তাই পরম দুঃখে কবি বলছেন—

"আজকের দিনে
সেই জন্যেই এত করে বন্ধুকে খুঁজি,
মানুষের সহজ বন্ধুকে
যে গল্প জমাতে পারে।"

দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন মানুষের এই সহজ অথচ দুর্লভ বন্ধু। এইটেই তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মানুষকে ভালবাসতেন বলেই, তিনি কোনদিন কোন শিক্ষার্থীকেই কোন কারণে তাঁর কাছ থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে দেননি। বাস্তবিক শিক্ষকতাকার্য্যে তাঁর কিছুমাত্র ক্লান্তি ছিল না। গান শেখাতে বসলে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন, আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতেন সুরের সাধনায়, এবং অত্যন্ত হৃদ্য মধুর সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের তিনি অতি অল্প সময়ে আপন করে নিতেন। তাই তাঁর শিক্ষাদান ছিল যেন এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তিনি যখন যেখানে যে অবস্থায়ই থাকতেন, তাঁর চতুর্দ্দিকে সঙ্গীতপিপাসু ছাত্র-ছাত্রীর দল ভিড় করে রীতিমত একটি সঙ্গীতবিদ্যালয় গড়ে তুলত। এই বিদ্যালয়টিকে তিনি কর্ম্মস্থলে, প্রবাসে, ভ্রমণে সর্ব্বত্র আপনার সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। ছাত্র-ছাত্রীদের ভালবাসার অত্যাচার কত ভাবেই না তাঁকে অহোরাত্র সহ্য করতে হত!

এই সঙ্গীতশিক্ষাদানের কার্য্যে একদিকে যেমন তাঁর কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেম্নি কার্য্যক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বও কম প্রকাশ পায়নি।

আড়াই বছর পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করে তাঁকে বলেছিলেন—

"রবির সম্পদ হোতো নিরর্থক, তুমি যদি তারে
না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।"

বাস্তবিক, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাধনায় দিনেন্দ্রনাথ জীবন সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের কর্ম্মজীবনের মর্ম্মমূলে সঙ্গীতের রসপ্রবাহ ছড়িয়ে দিয়ে তাকে অব্যাহত রেখেছিলেন তিনিই। তাঁর মেঘমন্দ্র কণ্ঠের অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথের গান যেন মূর্ত্তি ধরে প্রাণের তেজে হিল্লোলিত হয়ে উঠত; মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রোতৃবৃন্দ শুনত স্তব্ধ হয়ে, তাদের সমগ্র অস্তিত্ব উঠ্‌তো আনন্দে ঝঙ্কৃত হয়ে। গানের পর গান রচনা করেছেন কবি, আর তাকে অন্তরের দরদ দিয়ে প্রকাশ করেছেন সুরশিল্পী। প্রকাশও রচনারই একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। সেই হিসেবে রবীন্দ্রনাথের গানরচনার কৃতিত্বের একটা বড় অংশ দিনেন্দ্রনাথের প্রাপ্য। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের সূক্ষ্ম রসকে নিবিড়ভাবে উপভোগ করা সম্ভবপর হত, দিনেন্দ্রকণ্ঠ-নিঃসৃত তার একটী

বিশেষ রূপসৃষ্টির ভিতর দিয়ে। বোধ করি, এই অপরূপ রূপটী চোখের সামনে ফুটে উঠতে দেখেই কবি চিরদিন নব নব গান রচনা করতেও একটী সূক্ষ্ম গোপন প্রেরণা লাভ করে থাকবেন।

কিন্তু দিনেন্দ্রনাথ কবির গানকে শুধু যে অতুলনীয় ব্যঞ্জনার মহিমায় প্রকাশ করে গেছেন, এমন নয়। তিনি তাকে প্রচারও করেছেন দূরে দূরান্তরে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অপূর্ব্ব সম্পদরাশিকে শুধু যক্ষের ধনের মত সশঙ্ক ও সতর্ক কার্পণ্যে সংরক্ষণ করার ভার তিনি নিয়েছিলেন না। তিনি তার ভাণ্ডারদ্বার খুলে দিয়ে মুক্তহস্তে সঙ্গীতরাশিকে ছড়িয়ে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে, শুধু বাঙলাদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে, এমন কি তার বাইরে সাগরপারের বিদেশেও, দিনেন্দ্রনাথ তাঁর সংখ্যাতীত ছাত্র-ছাত্রীর শাখাপ্রশাখায় সেই গানের ধারাকে অবারিতভাবে সঞ্চারিত করে দিয়ে, তার মাধুর্য্য বিতরণের ব্রত স্বেচ্ছায় এবং পরম আনন্দে গ্রহণ করেছিলেন। এবং এই ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব আজ সর্ব্বজনবিদিত। সঙ্গীতরচনায় রবীন্দ্রনাথের যে সমুজ্জ্বল প্রতিভা, দিনেন্দ্রনাথই তাকে সর্ব্বসাধারণের গোচরে এনেছেন।

দিনেন্দ্রনাথ দিনের পর দিন যে সুরের প্লাবন বাঙলাদেশের দিক্‌দিগন্তে বিস্তৃত করে দিয়ে গেছেন, অজস্র তার ধারা, চিরপ্রবহবান তার স্রোতোবেগ। লোকচক্ষুর অন্তরালে কত গভীর এবং বিস্তৃতভাবে তার অন্তঃশীল ক্রিয়া চলছে, কে তা জানে? আমরা শুধু বলতে পারি, সুরের ভগীরথ শঙ্খনিনাদে যে স্বর্গীয় মন্দাকিনীকে দেশে বিদেশে প্রবাহিত করে দিয়ে গেলনে—

"গৌড়জন তাহে আনন্দে করিবে পান
সুধা নিরবধি।"

এই আনন্দ-রসধারা আমাদের দৃষ্টিগোচর নয় বলে যেন তার মূল্য আমরা অস্বীকার না করি, এবং দিনেন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তথা শান্তিনিকেতনের এই অপূর্ব্ব দানকে যেন বাঙলাদেশ কোনদিন ভুলে না যায়।

দিনেন্দ্রনাথকে কবি তাঁর 'সঙ্গীত-ভাণ্ডারী'র আখ্যা দিয়েছিলেন; এর একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। সকলেই জানেন, অস্পষ্ট সুরের গুঞ্জন যখন কবিচিত্তকে মথিত করে জাগিয়ে তোলে ভাবের অনুকম্পন, আর ভাব ও সুর কথার ভিতর দিয়ে আপনাদের প্রকাশ করবার ব্যাকুলতায় অশ্রান্তবেগে কেবলই পাখা ঝাপ্‌টাতে থাকে, তখনই জন্ম নেয় গান। তার পরিপূর্ণ রূপটি ধরা দিতে না দিতেই, কবির ডাক পড়ল 'দিনু'কে। কবির মুখে নবরচিত গানে তাঁর সংযোজিত সুরটি শুনে দিনেন্দ্রনাথকে সঙ্গে সঙ্গে তা আয়ত্ত করে নিতে হত, এবং চিরদিনের মত আপনার স্মৃতির গোপন কক্ষে তাকে অম্লানভাবে সঞ্চিত করে রাখতে হত। সঙ্গীতশিশুকে জন্মদান করেই কবিপ্রতিভা আর তার দিকে ফিরে তাকাবার প্রয়োজন অনুভব করত না। দিনেন্দ্রনাথের উপরই তখন ভার পড়ল আপন বুকের সমস্ত দরদ দিয়ে তাকে লালন-পালন এবং রক্ষা করার, ও যথাসময়ে তাকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে মুক্তি দেওয়ার। দিনেন্দ্রনাথ কি অনন্যসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে এই কাজটি করে গেছেন, ভাবলেও অবাক হতে হয়। তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি এই বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে, সন্দেহ নেই।

কিন্তু স্মৃতির মণিকোঠায় গানকে বন্দী করে রাখ্‌লে তার অবাধ বিচরণের ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। তাই তিনি অবসরসময়ে ভাণ্ডারে সঞ্চিত গানের স্বরলিপি রচনা করতেন বসে বসে। অনেকেই হয়ত জানেন, রবীন্দ্রনাথের রচিত সমস্ত গানের স্বরলিপি মুদ্রিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশের চেষ্টা চলেছে কিছুদিন থেকে। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত দিনেন্দ্রনাথ সেই কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি অকস্মাৎ এই জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কত অসংখ্য গানের অজ্ঞাত অপ্রকাশিত স্বরলিপির চাবিটিও যে সঙ্গে নিয়ে গেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। আজ তাঁর বিহনে এই ঘুমন্ত গানগুলোর সুরের সোনার কাঠির সন্ধান কে দিতে পারবে, কে আর তাদের জাগিয়ে তুলবে সজীব করে?

দিনেন্দ্রনাথের নাম সঙ্গীতের সঙ্গেই বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, তবু অভিনয়নৈপুণ্যের মধ্যে দিয়েও তাঁর কৃতিত্ব কম উল্লেখযোগ্য ছিল না। 'বিসর্জ্জন' অভিনয়ে রঘুপতির ভূমিকায় তাঁর সেই জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর এখনো যেন কানে বাজছে। রক্তবসনপরিহিত রক্তলোলুপ পুরোহিতের দীর্ঘ শালপ্রাংশু আকৃতি, তাঁর ঘূর্ণ্যমান চক্ষুর ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে যে তীব্র তীক্ষ্ণ ভৎ‍র্সনা ক্ষণে ক্ষণে গর্জ্জন করে উঠত, তার সুস্পষ্ট চিত্র চিরকাল হৃদয়ে অঙ্কিত থাকবে। তারপরে তাঁকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি আর একরূপে—অন্যকে অভিনয় শিক্ষা দিতে শিক্ষাগুরুর আসনে। সেখানে তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি, রসবোধের আভিজাত্য ও শিক্ষানৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হতে হয়েছে।

শুধু সঙ্গীত এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রে নয়, সকলরকম ললিতকলায় এবং সাহিত্যেও তাঁর রসবোধ ছিল প্রচুর। কবিত্বশক্তি ছিল তাঁর মজ্জাগত, তাঁর প্রতিভা সাহিত্যরচনায় নিয়োজিত হলে আপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিশিষ্ট স্থান অতি সহজেই অধিকার করে নিতে পারত। দিনেন্দ্রনাথ কবি ছিলেন, কিন্তু তাঁর কবিত্বশক্তির যথোচিত ব্যবহার করতে এই আপনভোলা লোকটী যেন একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। নিতান্ত খেয়ালের ঝোঁকে পড়েই হয়ত তিনি কখনো কখনো কবিতা ও গান রচনা করেছেন। তার কতক সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে, কতক বা অপ্রকাশিত, এমন কি হয়ত চিরদিনের মত অবলুপ্ত; তার কোন হিসেব রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন নি তিনি কখনো।

মনে হয় দিনেন্দ্রনাথের জীবনের ট্র্যাজেডি এইখানেই। তিনি বিচিত্র ও প্রচুর ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করে যেতে একেবারেই যেন উদাসীন ছিলেন। উঁচুস্তরের অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ অথবা সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে যেতে পারতেন তিনি ইচ্ছে করলেই; কিন্তু বাঙলা দেশের এই প্রতিভাবান পুরুষ তাঁর সুপ্ত প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন অথবা সচেষ্ট হলেন না জীবনে। আজ মরণের কোলে এই সমস্ত সমস্যা ও প্রশ্নের শান্ত সমাপ্তি ঘটেছে। কবি বলেছিলেন—

"প্রথম পঞ্চাশ বর্ষ রচি দিক প্রথম সোপান
দ্বিতীয় পঞ্চাশ তাহে গৌরবে করুক অভ্যুত্থান।"

কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চাশের অভ্যুদয় হতে না হতেই অতর্কিতে তিনি চলে গেলেন। আমরা তাঁর আত্মার সদগতি প্রার্থনা করি।

দিনেন্দ্র স্মরণে

শ্রীঅনাদি দস্তিদার

দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি শৈশবেই ঘটিয়াছিল, যখন প্রথম শিক্ষালাভার্থে শান্তিনিকেতনে যাই। সঙ্গীতশিক্ষাদান সম্পর্কেই আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়। সঙ্গীত ছাড়া তিনি আমাদিগকে ইংরাজীও শিখাইতেন। আমি অতি সংক্ষেপে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করিব।

তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, নিরহঙ্কার, ভদ্র ও মিশুক লোক ছিলেন। ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, যে-কোনো-রকম লোকের সঙ্গে তিনি সমানভাবে মিশিতে পারিতেন, এবং যে-কেহ তাঁহার সঙ্গে একবার আলাপ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে চিরদিনের জন্য মনে রাখিয়াছেন।

সঙ্গীতশিক্ষক হিসাবে তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার নিকট কোন গান শিক্ষা করিলে তাহা এরূপ ভাবে মনের মধ্যে বসিয়া যাইত যে, উহা ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল। সঙ্গীত শিক্ষাদানকালে তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না, বা বিরক্ত হইতেন না। আমাদের পক্ষে যাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে হইত, তাহাও তাঁহাকে সম্ভব করিতে দেখিয়াছি। একটি ছোট মেয়েকে দিয়া "বাল্মীকি-প্রতিভার" বাল্মীকির part করান, এবং একটি অবাঙ্গালী ছেলেকে দিয়া প্রথম দস্যুর part করান একমাত্র তিনিই সম্ভব করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও একজন উচ্চদরের অভিনেতা ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে বিসর্জ্জন, ফাল্গুনী, রাজা, বাল্মীকি-প্রতিভা প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়াছেন।

তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ হইলেও, Classical হিন্দুস্থানী গান, গ্রাম্য বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্ত্তন, ডি, এল রায়ের হাসির গান প্রভৃতিতেও অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ডি, এল রায়ের অতি আদরের শিষ্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে ফাল্গুনী উৎসর্গপত্রে সত্যই বলিয়াছিলেন "আমার সকল নাটের কাণ্ডারী, আমার সকল গানের ভাণ্ডারী।" রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গান তাঁহার জানা ছিল, এবং তাঁহার মত ভাব দিয়া রবীন্দ্রনাথের গান গাহিতে আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও শুনি নাই। রবীন্দ্রনাথকেও একদিন বলিতে শুনিয়াছি যে "আমার গান গাইবার জন্যই দিনুর জন্ম হয়েছিল।" রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়ে এবং সঙ্গীতোৎসবে তিনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ। তিনি না থাকিলে এই সমস্ত উৎসব এতদূর সফল হইত না। রবীন্দ্রনাথ গানে সুর যোজনা করিয়া দিনুবাবুকে শিখাইয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। কারণ কবি প্রায়ই সুর ভুলিয়া যাইতেন। দিনুবাবু স্বরলিপি করিয়া এবং ছেলেমেয়েদের শিখাইয়া গানগুলি প্রচার করিতেন। স্বরলিপি করার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়াছি। তিনি কোনরকম যন্ত্রের সাহায্য না নিয়া অথবা গুন্ গুন্ পর্য্যন্ত না করিয়া, চিঠি লেখার মত স্বরলিপি লিখিয়া যাইতেন; এবং আমাদের করা স্বরলিপি ঐ ভাবে সংশোধন করিতেন। এই স্বরলিপিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে, এবং

সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানকে জীবিত রাখিবে। এই স্বরলিপির দ্বারা রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচার বহুদূর হইয়াছে। দিনেন্দ্রনাথ নিজেও একজন সঙ্গীতরচয়িতা ছিলেন। কিন্তু নিজেকে কখনও জাহির করিতে ভালবাসিতেন না।

আমরা তাঁহার এত নিকটে থাকিয়াও তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই যে, তিনি এতগুলি গান লিখিয়া গিয়াছেন। অনেক গান ও কবিতা তিনি লিখিয়া নিজেই আবার নষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন; এবং যখন তাহাদের সঙ্গে মিশিতেন, তখন বয়সের ব্যবধান বোঝাই যাইত না। শান্তিনিকেতনে ছোট ছোট ছেলেরা তাহাদের পিতামাতা ছাড়িয়া দূরদেশ হইতে আসিত বলিয়া, তিনি ও তাঁহার স্ত্রী পূজনীয়া কমলা দেবী তাহাদিগকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মুখে বসাইয়া খাওয়াইতেন। সেই সৌভাগ্য ছোটবেলায় আমার বহুবার হইয়াছিল। শান্তিনিকেতনে আনন্দবাজার বা বাৎসরিক মেলা উপলক্ষে তিনি পকেটে টাকা নিয়া বাহির হইতেন, এবং সমস্ত দিন ছেলেমেয়েদের খাওয়াইয়া বা নানারকম আমোদ দিয়া পকেট খালি করিয়া বাড়ী ফিরিতেন।

শান্তিনিকেতনের বর্ষা একটি অতি আদরের জিনিষ। তাহার সঙ্গে এখানকার বর্ষার তুলনা হয় না। সেখানে বর্ষা নাবিলেই আমরা দল বাঁধিয়া ভিজিতে বাহির হইতাম। প্রবীণ অধ্যাপক ২।১ জন [illegible] ঘরেই থাকিতেন, কিন্তু দিনুবাবুকে ছাড়া হইত না। তাঁহাকে টানিয়া বাহির করা হইত এবং তিনিও আনন্দের সঙ্গে ছেলেদের সহিত ভিজিয়া ফিরিতেন। বর্ষায় প্রায়ই ক্লাস বন্ধ থাকিত এবং দিনুবাবুর ঘরে গানের আসর বসিত। তিনি নিজে গানের পর গান গাহিয়া যাইতেন, এবং ছেলেদের দিয়াও গাওয়াইতেন।

তাঁহার সম্বন্ধে বলার অনেক আছে। কিন্তু সময়াভাবে আজ তাঁহার আত্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া এইখানেই শেষ করি।

শান্তিনিকেতনে তিন পুরুষ

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তি বিশ্বভারতীর সহিত পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তস্য পুত্র ৺দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তস্যপুত্র সম্প্রতি স্বর্গগত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা তাঁহারা সম্যকরূপে জানেন, যাঁহারা এই তিন পুরুষের সহিত শান্তিনিকেতনে পরিচয় লাভের সুযোগ পাইয়াছেন।

বোলপুর হইতে শিউড়ীগামী পায়ে-চলা পথের পশ্চিম ধারে, শান্তিনিকেতনের সীমাচুম্বিত নীচু বাংলা নামক একটী তরুলতাপরিবেষ্টিত টালির বাড়ীতে থাকিতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। সে আজ ১০।১৫ বৎসরের কথা; তখনও দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঁচিয়াছিলেন। তখন শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর ব্যাপক রূপ ধারণ করে নাই। সদা সারল্যের অবতার, বিদ্যাভিমানবর্জ্জিত, জ্ঞানের আকর দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে সেকালে বেশী যাওয়াআসা ছিল রায়সাহেব জগদানন্দ রায়ের এবং রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ্ ও পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের ডাকও সেখানে প্রায়ই পড়িত। দর্শনবিষয়ক এক একটী প্রবন্ধরচনা শেষ হইলেই, শান্তিনিকেতনের শিক্ষকগণকে বড়বাবু আহ্বান করিতেন। সকলে তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করিতেন। বড়বাবুর কাছে নীচু বাংলায় যাইবার উৎসাহ সকলের থাকিত। সকলে সমবেত হইলে, বড়বাবুর সহিত আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত করিয়া দিতেন শাস্ত্রীমহাশয় কিম্বা জগদানন্দ বাবু অথবা নেপাল বাবু। অট্টহাস্যের ঝর্ণা ঝরাইয়া হৃদয়গ্রাহী দুচারিটী রসিকতা ও উপহাসাদির পর বড়বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পড়িতেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় তাঁহার "গীতাপাঠের" অধ্যায়গুলি রচনা হইতেছিল। বৃহৎ প্রান্তরের মধ্যে নিরিবিলি একটী কুঞ্জবন-নিভ বাগানের কুটীরে, জনকয়েক শান্তপ্রকৃতি রসগ্রাহী পরিবেষ্টিত হইয়া, বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ টেবিলে কয়েকটি মোমবাতি জ্বালাইয়া, সন্ধ্যায় গীতা সম্বন্ধে নিজের পাঠ সকলকে পড়িয়া শুনাইতেন—সে দৃশ্য যে কতটা অভাবনীয়, সেটা ভাষায় বিশ্লেষণ করিয়া বলা শক্ত। একদিনের কথা,—পাঠশেষ হইতেই বৃদ্ধ বড়বাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ) মৃদু হাস্যসহকারে জগদানন্দ বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "জগদানন্দ, উপহার পেয়েছ?"—জগদানন্দবাবু তাঁহার প্রচুর হাস্যসহকারে বলিলেন, পেয়েছি।

তারপর বাকী কথা বলিবার পূর্ব্বেই বড়বাবু অট্টহাস্যের ফোয়ারা ছুটাইয়া বলিলেন—"ভাল লেগেছে?"

জগদানন্দ খুব হাসিয়া বলিলেন—বেশ উপহার, ভারী মিষ্টি।

আবার উভয়ে খুব হাসিলেন। ব্যাপারটির রহস্যউদ্ঘাটন জন্য উপস্থিত সকলে ব্যস্ত। তারপরে জানা গেল, একদিন ক্লাসের কোন একটী মন্দবুদ্ধি ছাত্র অঙ্কের ক্লাসে ইচ্ছাপূর্ব্বক অমনোযোগী হওয়ায়, জগদানন্দ বাবু তাহার কর্ণমর্দ্দন করিতেছিলেন, সেই সময় বড়বাবু সেই ক্লাসের সন্নিকটের পথ দিয়া নীচু বাংলায় ফিরিবার পথে ঐ কর্ণমর্দ্দন কাণ্ড দেখিতে ।

বলা বাহুল্য জগদানন্দ বাবুর ন্যায় স্নেহময় ও কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং গণিত বিষয়ে শিক্ষাদানে যোগ্যতায় অসাধারণ পটু শিক্ষকের কাছে কর্ণমর্দ্দন পালা তাঁহার ক্লাসের যে ছাত্রের কর্ণের উপর হইত, সে ছাত্র নিজেকে ধন্য মনে করিত; কারণ সে জানিত ঐ কর্ণমর্দ্দনের পর মাষ্টার মহাশয় তাহাকে অধিকতর স্নেহের চক্ষে ও ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন, এবং তাঁহার অবসর সময়ে উহাকে কাছে ডাকাইয়া অঙ্কের বিষয়ে বিনা মজুরীতে কেবলমাত্র স্নেহের দাবীতে বেশী যত্নসহকারে কোচ করিবেন। বাস্তবিকপক্ষে জগদানন্দ বাবুর ন্যায় অমন স্নেহময়, কর্ত্তব্যপরায়ণ, ছাত্রমহলে প্রিয় শিক্ষক খুব কমই দেখা যায়।

জগদানন্দ বাবুর মহৎ প্রকৃতির পরিচয় দ্বিজেন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। তাই তিনি রসিকতা করিবার জন্য, ঐ কর্ণবিমর্দ্দন-অভিনয় দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিয়া গিয়াই কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি ভৃত্য মারফতে একটি পদ্যগোছের উপহার জগদানন্দ বাবুকে খামের মধ্যে করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যতদূর মনে পড়ে পদ্যটি এইরূপ—

শুনহ জগদানন্দ দাদা,
গাধাকে পিটিলে না হয় অশ্ব,
অশ্বেরে পিটিলে হয় গাধা।

বড় বাবু সমবেত শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে ঐ পদ্য-উপহার আবৃত্তি করিবামাত্র চারিদিক হইতে হাস্যধ্বনি উঠিল।

বড়বাবু ছিলেন দয়ার অবতার, সারল্যময় অনাড়ম্বরতার প্রতীক। তাঁহাকে অনেকে বলিত শিশু ভোলানাথ। তিনি ছিলেন দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সাহিত্যের রসসায়রে সন্তরণপটু মীন;— পল্‌কাভাবে উপরের জলেও ভাসিতে জানিতেন, আবার গভীর অতলেও ডুব দিতেন। বাছাইকরা আনুপ্রাসিক শব্দের সংযোজনে পদ্যে মধুর ধ্বনি সৃষ্টি করিবার অসাধারণ শক্তি তাঁহার ছিল। তাঁহার "স্বপ্ন প্রয়াণ" কাব্যের নদীবর্ণনার পদগুলির সামান্য নমুনা এইপ্রকার—

'সরিৎ ত্বরিৎ বহে—
তট চুমি চুমি।" ইত্যাদি।

তখন শান্তিনিকেতনে, সেকালের ভারতীয় এবং বঙ্গীয় জাতীয় জীবনের পরিচয় পাওয়া যাইত ঠাকুর পরিবারের এই তিন পুরুষে। রসে, গুণে, বিদ্যায়, বংশকৌলিন্যের মহিমায় পুরামাত্রা ভারতীয় বনেদী গৃহস্থের কেতাদোরস্ত রক্ষার সামঞ্জস্য রাখিয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ এবং দিনেন্দ্রনাথ। আর একটি কথাও ছিল সত্য,—সেটা এই যে, যাঁহারা তখন শান্তিনিকেতনে শিক্ষক ছিলেন, তাঁহাদের নবীন এবং প্রবীণের দল উভয়েরই মধ্যে ছিল ভারতীয়ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষায় সেকালের তপোবনের আদর্শের টানে শান্তিনিকেতনে জড় হইয়াছিলেন, কেবল চাকুরীর টানে নহে। তখনকার শান্তিনিকেতনে ভারতের সাধনাকে, ভারতীয় কেতায় এবং ভারতীয়

চলনে প্রকাশ করিবার আয়োজনের যে প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথ করিতেছিলেন, সেই প্রচেষ্টার পরীক্ষায় সকলেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে। কিন্তু এ কথা নিছক সত্য যে, যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা মিশাইয়া তৎকালের শান্তিনিকেতনের সেবকবৃন্দ আশ্রমের আদর্শের পন্থী ছিলেন। চাকুরী ছিল গৌণ ; আশ্রমে বাস করিবার সৌভাগ্যবোধ এবং আশ্রমে বাস করিয়া একটা আদর্শ পরীক্ষার কার্য্যে লিপ্ত থাকার আনন্দটা ছিল মুখ্য। তখনকার আশ্রমকর্ম্মীরা সেকেলেধরণের ছিলেন, সেইজন্য সেকেলে ভাব ও ধরণধারণের প্রতি তাঁহারা শ্রদ্ধাবান ছিলেন ; সেকালের কায়দাকানুন রীতিনীতির সমঝদার ছিলেন তাঁহারা।

সেকালের শান্তিনিকেতনে কেবলমাত্র একজন ম্যানেজারকেই আশ্রমে আগত অতিথিদের তত্ত্বাবধান করিতে হইত না—সকল অতিথিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কর্ত্তব্য-দৃষ্টি রাখিবার আনন্দময় দায়িত্ব ছিল সকল শিক্ষকের। অতিথিরাও তখন বুঝিতেন, তাঁহারা শুধু গেষ্ট্ হাউসেই থাকেন না, সমস্ত আশ্রমের চলতি প্রাণের সঙ্গেও তাঁহাদের সম্বন্ধ ঘটিতেছে। আশ্রমের অধিবাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও কলেবরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্য প্রয়োজনজনিত পরিবর্ত্তন বিশ্বভারতীতে ঘটিয়াছে ; হয়ত আরো পরিবর্ত্তন ঘটিবে। এই পরিবর্ত্তন-গতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যাঁহাদের চলিবার অক্ষমতা ঘটে তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করেন ; যাঁহাদের থাকিবার তাঁহারা থাকিয়া যান।

সেকালের কথা বলিতেছিলাম, সেকালের কথাই বলি। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার নীচু বাংলায় সন্ধ্যায় প্রায়ই প্রবন্ধ-পাঠ-সভা করিতেন, বাকী সময় দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে লিখনপঠনে ব্যস্ত রহিতেন। বিশ্রামের সময়ে—চারিদিকে বিবিধপ্রকারের বুনো পাখী, কাঠবিড়াল ইত্যাদিকে ছোলাছাতু খাওয়াইতেন এবং তাহাদের সহিত ভালবাসার সম্বন্ধ চর্চ্চা করিতেন। জঙ্গলী পাখীগুলি ঐ বৃদ্ধের মধ্যে পাইয়াছিল পরম আত্মীয়গোছের এমন একজন মানুষ যে কাকপাখীকে ছাতু দেয়, কিন্তু এক বেত হাতে লইয়া পাহারা দেয়, পাছে দুষ্টু কাক শালিখপাখীকে বঞ্চিত করে তাহার আহার্য্য হইতে, পাছে কুকুরটা কামড়াইয়া দেয় কাঠবিড়ালগুলিকে—পাছে দুরন্তপনাপরায়ণ শালিক ছানা আসিয়া বৃদ্ধের মাথায় কিম্বা চোখে ঠোক্‌রায়। বৈকালে এবং সকালে দক্ষিণের—কিম্বা পূবের বারান্দায়, বড় বাবু ছোলাছাতু লইয়া পশুপাখীদের জন্য ভোজনোৎসবের আসর জমকাইয়া বসিতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গীতে এক জায়গায় লিখিয়াছেন—

"শুনে তোমার মুখের বাণী
আসবে ছুটে বনের প্রাণী,
হয়ত তোমার আপন্ জনের
পাষাণ হিয়া গ'লবে না।"

বনের প্রাণী বড় বাবুর কাছে আসিয়া গান গাহিত, নৃত্য করিত, বুড়োর কাছে কত আদরআব্দার জানাইত। একদিন বৈকালে দেখি ঐ উৎসবে বড় বাবু খুব একটা হৈ চৈ বাধাইয়া দিয়াছেন ! অনুগত

প্রিয় ভৃত্য প্রভুপরায়ণ মুনীশ্বর বলিল ভারি মুস্কিল হইয়াছে, একটী কাঠবিড়াল আজ ৩।৪ দিন ধরিয়া আর আসিতেছে না ; তাহার খোঁজ কেমন করিয়া পাওয়া যায় বড় বাবু সেই কথা ভাবিতেছেন। তা ছাড়া আর একটা বিপদ হইয়াছে,—একটী কাক একটা কাঠবিড়ালের বাচ্ছাকে ঠোক্‌রাইয়া মারিয়াছে ; সেইজন্য কাককে শাস্তি দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন এই সর্ত্তে যে, কাককে শাসাইয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু প্রাণে মারা হইবে না। বড় বাবু সম্বন্ধে লিখিবার এবং বলিবার অনেক কিছু আছে, এমন একটি প্রবন্ধে সেরূপ করা যায় না। কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে এইখানে থামিয়া যাওয়া ভাল।

৺দিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র, সেকেলে মজ্‌লিশী ব্যক্তি। ইনি ছিলেন বন্ধুবৎসল, মিশুক এবং তৎকালীন শান্তিনিকেতনের অর্থসচিব ; বর্ত্তমান গেষ্ট্‌ হাউসের নীচের তলায় থাকিতেন। উত্তরের বারান্দায় একটি লম্বা কৌচে হেলান দিয়া বসিতেন, ফড়সী গড়গড়ায় সেকেলে কায়দায় টান দিয়া, বন্ধুগণের মজলিসে বসিয়া সেকালের গল্পগুজব ও সেই আড্ডায় বসিয়া আশ্রমের যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতেন, অভাবঅভিযোগের প্রতিকার করিতেন। পরলোকগত পিয়ার্স‍ন সাহেব দ্বিপু বাবুকে বলিতেন 'মহারাজা অফ্‌ শান্তিনিকেতন।' কোনক্রমে দ্বিপুবাবুর কাণে কোন শিক্ষকের কিম্বা কোন শিক্ষকের পরিবারের কাহারো অসুখবিসুখের খবর যাওয়া মাত্র দ্বিপুবাবু তাঁহার প্রিয় ভৃত্য বালেশ্বরকে পাঠাইয়া সব খোঁজ নিতেন ; তারপর যথাসময় প্রয়োজনীয় ফলমূল মেওয়া মাছ রোগীর গৃহে উপস্থিত হইত। এমনি করিয়া তিনি সামাজিকতা রক্ষা করিতেন, অথচ সে দানের ভিতর, সেই সব কর্ত্তব্যের ভিতর, ঘুণাক্ষরেও দরিদ্রের প্রতি ধনীর অনুগ্রহ কিম্বা কৃপাদৃষ্টি উঁকি দিত না। তিনি সেকালের প্রথায় এমন হৃদ্যতার সহিত সকলের সঙ্গে মিশিতেন, যাহাতে সকলে তাঁহাকে ভালবাসিত।

মজাদার সরস গল্পের ঝর্ণায় তিনি মজলিশকে ভরপুর রাখিতেন। বোলপুরের শিক্ষিত সমাজ আর শান্তিনিকেতন অধিবাসীদের সঙ্গে মিলনসম্বন্ধ ঘটাইবার তিনি ছিলেন সেতুস্বরূপ। ছেলেরা প্রায়ই দ্বিপুবাবুকে ধরিয়া পড়িত ভোজের জন্য, কিম্বা খেলাধূলার ব্যাপারে চাঁদা দিবার জন্য ; স্বভাবসুলভ গভীর স্নেহরসমিশ্রিত হুঙ্কার ছাড়িয়া হাঁকাহাকি করিয়া বলিতেন—"আর পারি না, রবিকাকার (রবীন্দ্রনাথের) কাছে এবার নালিশ করতে হবে, একি জুলুমে পড়লুম! বিনে পয়সায় ম্যানেজারী করে কেবলি গাঁঠের পয়সা খরচ করে ছেলেদের আব্দার পূরণ করা! এই, বালেশ্বর, এ্যাই শ্যাম, যাও শীগ্‌গির নেপাল বাবু কিম্বা ক্ষিতিমোহন বাবু কিম্বা জগদানন্দ বাবুকে ডেকে আনো—এই সব দুষ্টু ছেলেদের সায়েস্তা করে দিন—ওহে ছোক্‌রার দল, যাও বলছি শিগ্‌গির যাও—আমি দশ টাকা পাঁচ টাকা কিছুই দেব না ; বেশী যদি বাড়াবাড়ি কর, রবিকাকাকে লিখে জানাব।" হৈচৈ এবং হাঁকেডাকে ছেলেরাও তখনকার মত বিব্রত হইয়া দে ছুট। তারপর যেমনি কোন মাষ্টার মহাশয় আসিলেন—

জগদানন্দ বাবু অথবা নেপাল বাবু—অমনি দ্বিপুবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন বেশ গম্ভীরভাবে, (অথচ চোখের চাওয়ায় রসিকতার ভঙ্গী) "কিন্তু ভাল হচ্ছে না মশায়,—আমি কি এমন অপরাধ করেছি যে, আমাকে তাড়াবার জন্য আপনাদের এরকম একটা বদ্ধপরিকর ব্যবস্থা ?"

শিক্ষক—সেকি কথা, আপনি হলেন প্রজাপালক, আপনাকে তাড়ালে আমাদের বিপদ।

দ্বিপুবাবু—রসিকতা করচেন, রবিকাকাকে নিশ্চয়ই নালিশ করব, বলব এই সব ছাত্র লেলিয়ে-দেওয়ার দল এই সব মাষ্টার মহাশয়দের একটা কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করতে।

শিক্ষক—কি হয়েছে বলুন ত ?

দ্বিপুবাবু—সর্ব্বনাশ, মহা সর্ব্বনাশ! ছেলেরা দল বেঁধে এসে জেদ করে বল্লে—আপনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যান, এত অপমান কি সহ্য হয় ;—বলে কিনা সকলে, রান্নাঘরে আজ ভোজের আয়োজন করতে হবে। বলুন দেখি মশায়, এইরকম করে দফায় দফায় যদি আমাকে দিয়ে ভোজ আদায় করে, তাহলে আমি আশ্রমে টিঁকি কি করে ?

শিক্ষক—আপনি কি করলেন ?

দ্বিপুবাবু—বল্লেম, হবে না, এক্ষুনি চলে যাও, তা নাহ'লে জগদানন্দ কিম্বা নেপাল বাবুকে ডাক্‌ছি।

শিক্ষক—তাহলে তো গোল চুকে গেছে!

দ্বিপুবাবু—বেশ সহজ মীমাংসাই করলেন আপনি,—ওরা ভারি দুষ্টু, আবার আসবে। ওদের মধ্যে ঐ কিরণ দাস, ও ভারি বিপদ করবে। এর একটা কিনেরা করে দিন।

এইরূপে কিছুক্ষণ বাক্যাভিনয় চলার পর, দ্বিপুবাবু বলিলেন, কিরণকে পাঠিয়ে দিন আমার কাছে, ওর সঙ্গে পরামর্শ করা যাক্। ভোজই যদি দিতে হয়, তাহলে ভাল ভোজই হোক ; টাকাও দেব আর বদনামও নেব, তা হবে না। ওরা কি কি খেতে চায় জেনে, আমি নিজে সব ব্যবস্থা করব।

দ্বিপুবাবু ছিলেন এইরকমের দিলদরিয়া, মেজাজসরীফ ব্যক্তি। তাঁহার দরবারে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন প্রমুখ ব্যক্তি হইতে সামান্য ব্যক্তিদেরও স্থান ছিল ; এবং সকলকেই তিনি যথাযোগ্য আদরযত্নে খাতির করিতে জানিতেন। তাঁহার মজলিশী মানুষ রূপটি নজরে পড়িত প্রথম। তিনি ধনীর সেকেলে দিলদরিয়া রূপের প্রতীক ছিলেন।

৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের সকল গানের সকলরকমের কৃতী ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ সম্প্রতি হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার বন্ধুসমাজে ছাত্রছাত্রীসমাজে গভীর বেদনার সঞ্চার হইয়াছে, তাহা আজিও টাট্‌কা হইয়া আছে। শান্তিনিকেতনের সকলপ্রকার আনন্দোৎসবে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক। বন্ধুবাৎসল্যে, মজ্‌লিশী প্রকৃতিতে ছিল দিনুবাবুর (এদানিক সকলের দিন্‌দা)

বৈশিষ্ট্য। তিনি সাহিত্যিক ছিলেন উঁচুদরের, রসিকতায় ছিলেন ভরপুর। ছাত্রছাত্রী, যুবকবুড়ো সকলেই দিন্‌দার কাছে পাইতেন অপরিমিত রস। দিন্‌দা ছিলেন অমিতব্যয়ী—সব দিক দিয়া। বিধাতা দানযোগ্য যাহা যাহা দিন্‌দাকে দিয়াছিলেন—নিরহঙ্কারে, পাত্রপাত্রীনির্ব্বিচারে সে সব সকলকে দান করিতেন দিন্‌দা। বপুও যেমন ছিল বিশাল, হৃদয়ও ছিল তেমনি বিরাট। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত রচনা করিয়া তাহাতে সুর দিয়াই দিনদাকে তলব করিতেন,—দিন্‌দা সুর শিখিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে সে সুরকে স্বরলিপিতে বাঁধিয়া ফেলিতেন। প্রভাত গুপ্ত মহাশয় দিন্‌দার সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধে যথার্থ ই লিখিয়াছেন যে "দিন্‌দা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতিপালক।" রবীন্দ্রনাথের গানের সুরগুলি দিন্‌দার কাছে মাতৃস্নেহ পাইত। উপায় ছিল না কোন সুরের পক্ষে গান ছাড়িয়া পালাইবার। জোরাল কণ্ঠে মিষ্টি সুর প্রকাশ করায় দিন্‌দা আশ্রমে একচেটিয়া বিশেষত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দিন্‌দা সম্বন্ধে অধিক বলিবার এ প্রবন্ধে আর প্রয়োজন নাই—আজ বঙ্গের প্রায় সব মাসিক পত্রেই তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। এইটুকু বলা যথেষ্ট যে, তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতরাজ্যে যে অভাব ঘটিয়াছে, সে অভাব পূরণ হইবার নহে; এবং শান্তিনিকেতনেও তাঁহার আসন অধিকার করিবার মানুষ আর মিলিবে না।

প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে আর একটি কথা বলি, রবীন্দ্রনাথের সাধনক্ষেত্র-শান্তিনিকেতনে উপযুক্ত তিন পুরুষে ত্রিধারায় যে অমৃত বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন, সে অমৃতধারা আশ্রম-জীবনে যে কতখানি সম্পদ দিয়া গিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলা শক্ত। ইঁহারা ছিলেন শান্তিনিকেতনবাসী, শান্তি-নিকেতনের ইতিহাসে ইঁহাদের নাম অক্ষয় হইয়া রহিবে। এক্ষেত্রে বলা প্রাসঙ্গিক হইবে যে, বঙ্গলক্ষ্মীর সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমলতা দেবী (সাধারণের কাছে এবং শান্তিনিকেতনে বড়মা বলিয়া পরিচিতা) দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ, অর্থাৎ দ্বিপেন্দ্রনাথের স্ত্রী, দিনেন্দ্রনাথের মাতা। শান্তিনিকেতনের শিশু ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এক সময় ছিল ইঁহার হাতে। যে সময় ইনি শিশুদের যত্নের ভার লইয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে সে সময় আমিও ছিলাম শিশুবিভাগের ছেলেদের দেখাশোনা করিবার জন্য একজন বেতনভোগী কর্ম্মী। সে একদিন গিয়াছে, যেদিনের স্মৃতি চিত্তে আজো আনন্দের সঞ্চার করে; অথচ সে অতীত কালকে আর ফিরিয়া পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। আশ্রমের পরিসর তখন ছিল ছোট, অথচ সেই ছোট নিঃস্ব শান্তিনিকেতনের মধ্যেও চারিদিক দিয়া একটা সহজ প্রাণের আনন্দ বহিত। তখনকার আর্থিক দারিদ্র্য এখনকার মতই রবীন্দ্রনাথকে সর্ব্বদাই চিন্তাকুল করিয়া রাখিত—কিন্তু সেই দারিদ্র্য-বালুর ভিতরে ভিতরে ফল্গুধারার মত বহিত—রবীন্দ্রনাথের অদম্য উৎসাহ এবং আশ্বাস, দ্বিজেন্দ্রনাথের অমায়িকতা, দ্বিপেন্দ্রনাথের সামাজিকতা, দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীতঝর্ণা, অপার স্নেহময়ী কর্ত্তব্যপরায়ণা বড়মার অকৃত্রিম অনুরাগে শিশুদের পরিচর্য্যায় সহযোগীতা, এবং শাস্ত্রী মহাশয়, জগদানন্দ বাবু, নেপাল বাবু, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, বঙ্কিমচন্দ্র রায় প্রমুখ শিক্ষকগণের রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীবীণাপাণি সান্যাল

এখনও কাণে সে সুরের রেশ ঝঙ্কৃত হইতেছে—

"কে যায় অমৃতধাম যাত্রী,
আজি এ গহন তিমির রাত্রি।"

কিন্তু যে সুরনায়ক গাহিয়াছিলেন, তিনি নিজেই আজ তাহাদের একজন যাত্রী,—সেই অমৃতধামের পথেরই পথিক। আজ আমাদের বাঙলা দেশবাসীর সকলেরই শুভেচ্ছায় সেই যাত্রার পথ উজ্জ্বলতর হোক, নির্ম্মলতর হোক, নিষ্কণ্টক হোক। কিন্তু বাংলার কণ্ঠ আজ রুদ্ধ, বাঁশী সঙ্গীতহারা, তাহার কণ্ঠে তাঁহার যাত্রাপথকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিবার মত সুর নাই।

আজ আমরা অন্তরে অন্তরে আমাদের সুরের দৈন্য খুব বেশী করিয়া অনুভব করিতেছি। মন চাহিতেছে—তিনি যেমন করিয়া অমরাত্মাদের তান লয় মূর্চ্ছনা দিয়া অমরাবতীতে পাঠাইয়াছেন, আমরাও তাঁহাকে সেইরূপ করিয়াই সেখানে পাঠাই ; কিন্তু গান গাহিতে গিয়া দেখি, আমরা যে সুরের কাঙ্গাল।

শৈশবের স্মৃতির মধ্যে তাঁহার স্মৃতিই বড় হইয়া দেখা দেয়। তাঁহাকে বিচিত্ররূপে দেখিয়াছি তাঁহার মধ্যে মানবোচিত গুণরাজির মধুর সম্মিলন দেখিয়াছি। দেখিয়াছি বর্ষা অজস্র ধারায় বারিবর্ষণ করে। সেই বর্ষণের মধ্যে বাণী রহিয়াছে—হে ধরিত্রী! আমার শ্যামল বর্ষণে তোমার তপের তাপের বাঁধন কাটুক। তখন প্রকৃতির উদারতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বিস্মিত হইয়াছি, যখনই ভাবিয়াছি ধরণী অযাচিতভাবে বর্ষার বারিসিঞ্চনে শ্যামল হইয়াছে। আমার হৃদয়মরুতে দিনূদাকে বর্ষা মনে হইয়াছে—তাঁহার স্নেহধারাকে বর্ষার বারিধারার অপেক্ষাও উদার মনে হইয়াছে। তখনই মনে হইয়াছে, শুধু প্রকৃতি নয়—মানুষের নিকট হইতেও অযাচিত ভাবে আমরা পাইতে পারি। যখনই তাঁহার নিকট হইতে অপ্রার্থিতভাবে স্নেহ পাইয়াছি, তখনই পরম কল্যাণের আশীর্ব্বাদহস্তের স্পর্শ অনুভব করিয়াছি। তাঁহার স্নেহের দান কখনও প্রতিদান খোঁজে নাই। তাঁহার মধ্যে দয়া মায়া, আন্তরিকতা, আতিথেয়তা, স্নেহকোমলতা, কোন গুণেরই কার্পণ্য দেখি নাই।

এখনও মনে হয় শৈশবের সেই মধুর স্মৃতি। তখন ছোট ছিলাম, শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছাত্রী-জীবন যাপন করি। যে সময় বালকবালিকারা পিতামাতার স্নেহের ছায়ায় মানুষ হইয়া উঠে, সেই সময়ই আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে অনেকদূরে! কিন্তু কোনদিনের জন্যও তাঁহাদের অভাব বোধ করিবার সুযোগ দিনূদা দেন নাই।

তিনি আমাদের নিজের কন্যার মত স্নেহ করিতেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, তাই বোধহয় স্নেহকে অমন উদারভাবে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের যত শিশুসুলভ আব্দার খেয়াল, তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে পূর্ণ করিতেন।

একদিন আমরা কয়েকজন তাঁহার বাড়ীতে গিয়া খুব দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছি। হৃদয়ে তখন চাঞ্চল্যের প্রাধান্য, বলা বাহুল্য। তাঁহার রান্নাঘর, খাবারের আলমারী হইতে ফুলফলের বাগান, কেহই আমাদের হাত হইতে মুক্তি পায় নাই। তিনি তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার চাকর বোধ হয় ভাবিল তাহার প্রভু তাহার উপরই আসিয়া রাগ প্রকাশ করিবেন। অগত্যা সেও আমাদের উপর তাহার যত রাগ ছিল, সব উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল—এবং ইহাও বলিয়া দিল যে আমরা যেন আর সেখানে না যাই। আমরাও তাঁহার বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। তিনি আমাদের অভাব খুব অনুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমাদের অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানের কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরাও সব বলিলাম। তিনি বলিলেন, আমরা যেন তাঁহার বাড়ীতে আবার যাইতে আরম্ভ করি। পরে জানিতে পারিলাম তিনি তাঁহার চাকরকে বলিয়াছেন—"আমার ছেলেমেয়েরা যদি আমার বাড়ীতে দৌরাত্ম্য করতো, তুমি কি তাদের কিছু বলতে পারতে? অতএব ওরা যদি আমার বাড়ী, আমার বাগান লুঠও ক'রে নিয়ে যায়, তুমি ওদের কিছু বলবে না।" তিনি প্রায়ই বলিতেন—

"ঘরে আমার একটুক্ষণ না যদি রয় দুরন্ত
কেমন ক'রে হবে যে মোর বুকের শূন্য পূরন্ত।"

তাঁহার বাড়ীতে আমাদের অবারিত দ্বার, অবাধ গতি ছিল।

তিনি যখন আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, তখন আমরা তাঁহাকে আমাদেরই একজন সমবয়সী মনে করিয়াছি। তাঁহার রসিকতা শুনিয়া কেহ না হাসিয়া পারিত না। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের সঙ্গেই তাঁহার সমান যোগ ছিল।

যখন আশ্রম হইতে চলিয়া আসি, তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন। নিজে সামনে বসিয়া পরম আদরের সহিত আমাকে খাওয়াইতেছেন, আর মাঝে মাঝে গানের সুরে বলিতেছেন—

"যতই যাবে দূরের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হ'য়ে টানবে নাকি ব্যথার টানে।"

কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে, তিনি স্নেহসিক্ত স্বরে সান্ত্বনা দিলেন—"মন খারাপ করিস্ না, কেবল মনে কর্—আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।"

তাঁহার সঙ্গে শেষ দেখা কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। তিনি আমাকে অনেকদিন পরে দেখিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলেন, বলিলেন—"কতদিন থেকে যে ভাবছি, তোকে দেখব, কিন্তু দেখা আর হ'য়ে উঠছে না। তোরা যে কি ক'রে এত সহজে ও এত শীগ্‌গির স্নেহের বাঁধন কাটিয়ে উঠিস্। আমরা তো পারিনা রে!" তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, নানান অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্যে রহিয়াছি, ইচ্ছা থাকিলেও আসা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহার দৃঢ় ধারণা, এমন

কোন অবস্থাবিপর্য্যয়ই হইতে পারে না, যাহা স্নেহের সম্বন্ধকে অস্বীকার করিতে পারে। আসিবার সময় বারবার করিয়া বলিয়া দিলেন আবার আসিতেই হইবে।

আজ দেখিতেছি তিনিই তো সকলের আগে স্নেহের বাঁধন কাটাইয়া গেলেন। এই পার্থিব জগতে মনটাও পার্থিব হইয়া গিয়াছে।

মন যখন শোকাভিভূত হইয়া পড়ে তখন কোন দার্শনিক ব্যাখ্যাই তাহাকে সান্ত্বনা জোগাইতে পারে না, মন তখন এত অশান্ত হইয়া পড়ে যে কিছুই মানিতে চায় না। যখন ভাবি তিনি নাই, তখন অনেকখানি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। তাই বোধহয় "তিনি নাই" এ কথা মন কিছুতেই স্বীকার করিতে চায় না। পূর্ব্বের মতই মনে হয় তিনি আছেন। তবে তাঁহার ও আমার মধ্যে পথের ব্যবধান রহিয়াছে। আবার যখন দেখি ব্যবধান দুরতিক্রম্য, দুর্লঙ্ঘ্য, হৃদয় অধীর হইয়া পড়ে।

বাংলার শতসহস্র অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের সঙ্গীত—

"সুরের গুরু দাও, দাও, দাওগো সুরের দীক্ষা
মোরা সুরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা।
* * *
তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাব, যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।"

শুনিয়া তিনি নিশ্চয়ই অমরাবতী যাত্রার পথে অতিক্রান্ত পথের দিকে বারবার দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহারও নিশ্চয়ই আমাদের মায়া কাটাইতে বুকে ব্যথা বাজিতেছে,—কিন্তু উপায় নাই।

মহাসিন্ধুর আহ্বান আসিয়াছে—সাড়া দিতেই হইবে।

স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"ভবিষ্যৎ" পত্রিকা হইতে

পৃথিবীর মাটির সঙ্গে মানুষ কোনদিনই মৌরশী পাট্টার বন্দোবস্ত করতে পারেনি। মানুষকে এ মাটিরতৈরী পৃথিবীকে একদিন বিদায় জানাতেই হবে—এটা চিরন্তন সত্য। তাই মৃত্যু হ'ল জীবনের একটা অতি স্বাভাবিক ঘটনা। এ অবশ্যম্ভাবী ঘটনার জন্য দুঃখ করবার কোন হেতু নাই। কিন্তু মানুষ তবু দুঃখ করে, দুঃখ করে মৃতের সঙ্গে নিজের স্বার্থহানির জন্যে। এ স্বার্থ কখনও বা ব্যক্তিগত, কখনও বা সমষ্টিগত। দিনেন্দ্র বাবুর মৃত্যুতে যে দুঃখের সঞ্চার হয়েছে, তার পিছনেও আছে জনসমাজের একটা স্বার্থ। তাঁর মৃত্যুতে দশের অপূরনীয় ক্ষতি হয়েছে এবং এইটেই হচ্ছে দুঃখের সব চেয়ে বড় কারণ। দিনু বাবুর মৃত্যুতে প্রাচ্য সঙ্গীতের বিশেষ ক্ষতিসাধন হয়েছে, বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের। সঙ্গীত বলতে আমরা একটি কথাকেই বুঝি ; কিন্তু এই একটি কথার মধ্যে দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন সত্তা রয়েছে—এ দুটি হ'ল কথা ও সুর। সঙ্গীতের কথা যেমন ভাবদ্যোতক না হ'লে শ্রোতাকে সম্পূর্ণভাবে আনন্দ দিতে পারেনা, তেমনি সুরের সৌন্দর্য্যবিকাশ না হ'লেও তা একেবারেই ব্যর্থ হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের আজ যে জনপ্রিয়তা হয়েছে, তার জন্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন দায়ী, তেমনি সমান কৃতিত্ব দাবী করতে পারতেন দিনেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ হ'লেন তাঁর সঙ্গীতের আত্মা। আর তার সুস্পষ্ট রূপ হলেন দিনেন্দ্রনাথ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্নদের মধ্যে দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম।

কাব্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ, শিল্পে যেমন অবনীন্দ্র ও গগনেন্দ্র যুগপ্রবর্ত্তন করেছিলেন ; দিনেন্দ্রও তেমনি সঙ্গীতলোকে তাঁর অসামান্য বৈশিষ্ট্যের ছাপ দিয়ে গেছেন। বোলপুর শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন তিনি। একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গীতশিক্ষা দিতেন, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে। যে শান্তিনিকেতন শিক্ষাকেন্দ্রে তিনি তাঁর সঙ্গীত অধ্যাপনার ব্রতে জীবন কাটিয়ে দিলেন, তার বিনিময়ে তিনি কিছুই চাননি।

— ধন, জন, সেবা প্রভৃতি দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে যাঁরা শান্তিনিকেতনের গ'ড়ে ওঠায় সহযোগিতা করেছেন, দিনেন্দ্রনাথকে তাঁদের শীর্ষস্থানীয় বলা চলে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে রূপ দিতে তিনি যে মূল রাগিনী থেকে বিচ্ছিন্ন মিশ্রসুরের বন্ধুর গতির উদ্ভাবনা করেছিলেন,* তা শুধু কথার সঙ্গে সুরকে অভিন্নসূত্রে গ্রথিত করবার জন্যেই ; রাগরাগিণী জ্ঞানের অভাববশতঃ নয়। ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে তিনি সুর শিক্ষা করেছিলেন। ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি সঙ্গীতের কঠিনতম বিভাগেই তাঁর নেশা ছিল বেশী।

* এই প্রবন্ধের স্থানবিশেষ পাঠে মনে হয় যেন লেখকের ধারণা এই যে, পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের গানে ৺দিনেন্দ্রনাথ সুর সংযোজনা করেছেন। এই ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত, তা' বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁর কৃতিত্ব ছিল রচনায় নয়, প্রকাশে ; উদ্ভাবনায় নয়, প্রচারে।

ব্যক্তিগত জীবনেও দিনেন্দ্রনাথ কতকগুলি অসামান্য গুণের অধিকারী ছিলেন; এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হ'ল তাঁর অমায়িকতা। বয়সের ভেদকে তিনি কখন মানেননি। যে-কোন বয়সের লোকের সঙ্গে তিনি প্রাণ খুলে আলাপ করতেন। তিনি যে বড়, এ সচেতনতা তাঁর এক বিন্দুও ছিলনা; তাই তিনি ছিলেন সকলের 'দিন্‌দা'। দিনেন্দ্র ছিলেন আনন্দের পূজারী—পুরোপুরি optimist.

ছোটখাটো জিনিষের ভিতর দিয়েও আনন্দ তিনি তৈরী করতে পারতেন। এই সদাহাস্যময় সুরসিক লোকটির সঙ্গে এক মিনিটের জন্যও যাঁর যোগাযোগ হয়েছিল, তাঁর মনেই দিনেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে একটি গভীর ছাপ রয়ে গেছে!

আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা এখনও অন্ধকারে। তবে এটুকু স্থূল সত্যে আমরা বিশ্বাস করি যে, এই পৃথিবীতে তাঁর কর্ম্মময় জীবনের ছেদ পড়েছে। আত্মা ব'লে যদি কিছু থেকে থাকে, আর মানুষের শুভেচ্ছায় যদি তার বিন্দুমাত্র আনন্দের সঞ্চার সম্ভব হয়, তবে আমরা অন্তরের সঙ্গে তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা করছি।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার

সুরলক্ষ্মীর বরপুত্র সঙ্গীতাচার্য্য ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতিতর্পণ ক'র্‌তে ব'সে নূতন করে বল্‌বার মত কিছুই নেই। এই উপলক্ষে তাঁর স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে, তাঁর বিয়োগজনিত দুঃখের লাঘব ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ছি।

এক কথায় বল্‌তে গেলে তিনি ছিলেন, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অমর-লেখনীপ্রসূত গীতসমূহের একমাত্র স্বর-ভাণ্ডারী। কবির ভাষা ও সুর তাঁর কাছে রূপ পেয়ে হয়েছিল মূর্ত্ত ও প্রাণবন্ত!

বাংলা ১৩৪০ সালের মহালয়ায় তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়, তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে; সঙ্গে ছিলেন তাঁরই অন্যতম প্রিয় শিষ্য বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দস্তিদার। আমার মত সুদূর দেশবাসীর পক্ষে তাঁর মত বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করা কল্পনাতীত ছিল। সেই উদার মহাপ্রাণ কলাবিদের কথা যখন ভাবি, তখনই শ্রদ্ধায় হৃদয় ভরে' উঠে সেই মহাপ্রাণের উদ্দেশে। তাঁর সহিত সামান্য আলোচনাতেই তাঁর অন্তরের প্রকৃত মানুষটির পরিচয় পেয়েছিলাম। তিনি যেমন আত্মভোলা সুর-প্রেমিক ছিলেন, তেমনি অন্যকেও তিনি আত্মভোলা করতে পারতেন। তাঁর বহুমূল্য উপদেশ ছাড়া আমার "গীতিকুঞ্জ" এতটা সাফল্যমণ্ডিত হত কি না সন্দেহ। সুর সম্বন্ধে ও আমার গীতিকুঞ্জ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে সেই দিনের সুদীর্ঘ আলোচনার কথা আজীবন আমার মনে উজ্জ্বলভাবে জাগ্রত থাকবে। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর উপদেশ আমার সঙ্গীতসাধনায় চিরকাল সাহায্য করবে।

ভুজেশ্বর
শ্রীহট্ট

স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

রবির সুরের রঙে
হে দিনেন্দ্র তুমি
রঙাইয়া দিলে চিত্ত মোর,
জীবন-প্রভাতকালে
সুপ্ত ছিল সবি,
কাটে নাই যবে তন্দ্রাঘোর।

মধ্যাহ্ন গগনে দেখি
সেই রঙ দিয়ে
ভরালে ভরিলে অলক্ষ্যেতে।
পূর্ণতার পুণ্য তুমি
বিতর সঙ্গীতে—
এই ভাবে পথে যেতে যেতে।

দিনেন্দ্র-স্মরণে *

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

আজিকেও বরষিছে শ্রাবণের মেঘপুঞ্জমালা
আজিও গাহিছে গান ধরিত্রী সুন্দরি,
পরাণের বীণাতন্ত্রে ছন্দঃ নব ঝঙ্কারি' নিরালা
স্মরণের গাহি গান আপনি গুঞ্জরি'।

এমনি মধুর এক বরষার উৎসব-লগন—
সুরমগ্ন ছিলে তুমি, হে সুর-পূজারী।
সহসা আসিল তব স্বরগের নব নিমন্ত্রণ,
হেথাকার সুরলীলা গেলে তাই ছাড়ি।

মুখরিত সুরসভা স্তব্ধ হ'ল যেন চিরতরে,
শোকের নিবিড় ছায়া অমা-রাত্রি সম,
ধীরে ধীরে আবরিয়া হৃদয়ের গভীর কন্দরে
বেদনার পূতঅশ্রু ঝরাইল মম।

দুঃখ মোর থাক্ প্রাণে বিধাতার নিষ্ঠুর আঘাতে,
জানি তাহা জগতের চিরন্তনী রীতি;
মানবের মৃত্যু আনে রূপান্তর অমর আত্মাতে
নিখিল বিশ্বেতে রাখি' গৌরবের গীতি।

হে সুর-নৃপতিশ্রেষ্ঠ! আজি এই পুণ্য-স্মৃতি-দিনে
ঊর্দ্ধ হ'তে দিও তুমি তব পুরস্কার,
বাজুক তোমার মন্ত্র অন্তরের ছন্দঃপূর্ণ বীণে
আজি তুমি লও মোর শ্রদ্ধা-নমস্কার!

---

* গত ১৯শে জুলাই বেতারে অনুষ্ঠিত প্রথম বার্ষিক স্মৃতি-সভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

দিনেন্দ্র-স্মৃতি

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঘন মেঘের স্বনে বিদ্যুতের চমকনে
সবে সুরু বরষা-বোধন,
কেতকী কদম্ব বনে হের এ ভরা শ্রাবণে
উৎসবের পূর্ণ আয়োজন।

'নাটের কাণ্ডারী', আজি তব পথ চেয়ে আছি,
'সুরের ভাণ্ডারী', ধর সুর,
আশা ও উদ্বেগ প্রাণে, ধৈর্য্য আর নাহি মানে
দেহমন রসতৃষাতুর।

অঝোর বাদল-ধারে বনানীর বীণা-তারে
মল্লার হবে না মর্ম্মরিত ?
গোপন মর্ম্মের তলে বেদনার ধারা-জলে
কোন্ সুর আজি উচ্ছ্বসিত !

নাটমঞ্চে ধরণীর তুলি পাট, হে অধীর,
নটেশের আপন অঙ্গনে
উদার অক্ষয় যেথা জীবন-উৎসব, সেথা
আহ্বান কি পেলে সঙ্গোপনে ?

শারদ-উৎসবে যবে ছুটির বাঁশরী-রবে
ঘরে মন বাঁধন না মানে।
কিশোর প্রাণের সাথে যে প্রবীণ গানে মাতে,
যাদু যার বনপথে টানে।

এবার ধানের ক্ষেতে শ্যামল অঞ্চল পেতে
কাশের রাশিতে হাসি আঁকি,
অনুনয় জাগে যবে "সে কোথায় ?"—মোরা সবে
কি ভাষায় তারে দিব ফাঁকি ?

জ্যোৎস্না-রজনীর মায়া কণ্ঠে তব ধ
ক্লান্তিহীন রসের প্লাবনে
পূর্ণিমার পাত্র ভরি সহস্র ধারায় ঝ
তৃপ্ত করে তুচ্ছ অকিঞ্চনে

বাসন্তী-পূর্ণিমা রাতে শিহরিত মধুব
এবার নিঃশ্বাস শুধু ফেলা,
সে কোন্ নূতন দেশে বুঝি নব পরি
হ'ল সুরু উৎসবের মেলা !

ফাল্গুনের শালবীথি মঞ্জরিত হয়ে নি
ধূলায় পাতিবে পুষ্পাসন,
পলাশে অশোক-শাখে অনুরাগরক্ত
জাগিবে পুঞ্জিত সম্ভাষণ,—

সে আনন্দে নিখিলের, সেই নব ফ
ললাটে কুঙ্কুম দিতে আঁ
হে চির-আনন্দময় তোমারে না হ'
ভোল নিদ্রা, খোল খোল

সুরের ভাণ্ডার খুলি কোন্ পথে
কে ভোলা এমন দিল ডা
কাহারে সঁপিতে প্রাণ কণ্ঠে নিলে
সে কি সুন্দরের অনুরাগ

হে সুরেন্দ্র ! গেছ চলে জানি সুর
নন্দনের আনন্দভবনে,
প্রাণের ভ্রমর বুঝি এতদিনে পেল
চিরমধু বাণীপদ্মবনে ?

রাখীপূর্ণিমা,
১৩৪২